এ.কে.এম. নাজির আহমদ

পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আন্ নূর প্রকাশন
ঢাকা

প্রকাশনায়
মনোয়ারা বেগম
আন্ নূর প্রকাশন
৩১৮/১ সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫
দ্বিতীয় প্রকাশ অগাস্ট ২০০২

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

Purush o Mahilader Shabhabik Karmakhetra written by AKM Nazir Ahmad & Published by Monowara Begum 318/1 Senpara Parbata Mirpur Dhaka-1216 First Edition June 1995 Second Edition August 2002 Price Taka . 30.00 only.

সূচীপত্র

১. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

পুরুষ ও মহিলা উভয়ই মানুষ। মানুষ হিসেবে তাঁরা অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের একজন পুরুষ মানুষ এবং অপর জন মেয়ে মানুষ সেহেতু তাঁদের মাঝে ভিন্নতাও আছে।

জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষগণ সবল, মহিলাগণ দুর্বল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাগণ সবল, পুরুষগণ দুর্বল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে কঠোরতা-নির্মমতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষগণই যোগ্য বলে প্রমাণিত। আবার যেইসব ক্ষেত্রে নম্রতা-কোমলতা প্রয়োজন, সেইসব ক্ষেত্রে মহিলাদের উপযুক্ততা অনস্বীকার্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষদের দেহকে পেশীবহুল ও শক্তিশালীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের দেহ কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী। তাঁদের মাঝে কষ্ট সহিষ্ণুতার মাত্রা বেশি। দুর্ধর্ষতা, সাহসিকতা, ক্ষিপ্রতা, দৃঢ়তা এবং কঠোরতা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। তাঁদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা প্রবল। এইসব গুণ পুরুষদেরকে বাইরের কাজের উপযুক্ততা দান করেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহিলাদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের দেহ কঠোর পরিশ্রম করার এবং ভারী বোঝা বহনের উপযোগী নয়। নম্রতা, বিনয়, মায়া-মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। তাঁদের মাঝে প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা বেশি। গৃহাংগনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা এবং পরিবার-পরিসরকে মায়াময় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের জুড়ি নেই। মানব বংশকে গর্ভে ধারণ, প্রসব, স্তন্য দান এবং লালন পালনের ক্ষেত্রে তাদের কোন বিকল্প নেই। দৈহিক ও মানসিক এইসব বিশিষ্টতার কারণে মহান আল্লাহ গৃহকেন্দ্রিক কাজগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব দিয়েছেন মহিলাদেরকে।

অর্থাৎ সৃষ্টিগত ভিন্নতার ভিত্তিতেই জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পুরুষ মানুষ এবং মেয়ে মানুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছেন।

২. পরিবার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

পরিবার প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার প্রথম বুনিয়াদ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (রা) সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিলো প্রথম পরিবার।

পরিবার হচ্ছে সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানব সন্তানকে মনস্তাত্বিকভাবে সুস্থরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন মাতৃস্নেহ। আবার তাকে দৈহিকভাবে সবলরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন মাতৃদুগ্ধ। একটি সুখী ও দায়িত্বশীল পরিবারের সন্তানেরাই কেবল সুস্থমনা ও সবলদেহী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে।

মাতৃদুগ্ধ পান না করে যারা বেড়ে ওঠে তাদের মাঝে রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা কম থাকে। আবার, মাতৃস্নেহের উষ্ণতা বঞ্চিত হয়ে যারা গড়ে ওঠে তাদের থাকে অসুস্থ মন। আর এই অসুস্থ মনই হচ্ছে অপরাধ প্রবণতার প্রধান উৎস।

একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ছাড়া যেমন একটি অফিস, স্কুল কিংবা কলেজ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না, তেমনি একজন সার্বক্ষণিক পরিচালিকা ছাড়া একটি পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া পরিবার নামের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে সুখ, শান্তি ও কল্যাণের কেন্দ্রে পরিণত করে।

স্বামী বাইরে কাজ করে ঘরে ফেরেন। আবার, সারাদিন পরিবারের বহুবিধ ঝামেলা পোহাতে গিয়ে স্ত্রীও ক্লান্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরিবার পরিসরে স্বামী এবং স্ত্রী যখন একে অপরের মুখোমুখি হন তখন উভয়ের ক্লান্তি কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়। প্রশান্তির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মনে। একটা সুখানুভূতি খেলে যায় তাঁদের অস্তিত্বের পরতে পরতে। এমন অনাবিল সুখ লাভের আর কোন বিকল্প স্থান নেই।

পরিবার এক ধরনের দুর্গ। যেই জাতি এই দুর্গ বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই জাতি ভিন্ জাতির হাতে সামরিকভাবে পরাজিত হলেও অনেকাংশে সংরক্ষণ করতে পারে তাদের নিজেদের আদর্শিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

পুরুষের মতো মহিলাগণও যদি বাইরের কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে পরিবার প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর পরিবার প্রতিষ্ঠানের ভাংগন একটি জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

৩. মহিলাদের ওপর অর্পিত কাজের বড়ত্ব

মানুষের সামষ্টিক জীবনের প্রথম বুনিয়াদ হচ্ছে একটি পরিবার। এথেকে উৎপত্তি ঘটে বহুসংখ্যক পরিবারের। এইসব পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে গোত্র। বহু সংখ্যক গোত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে গোত্রগুচ্ছ। শেষাবধি গোত্রগুচ্ছগুলো পরিণত হয় একটি জাতিতে। কালক্রমে সেই জাতি থেকে বহু জাতির বিকাশ ঘটে।

কোন জাতির সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে রাষ্ট্র সংগঠন। নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন রকমের স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করা, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, কৃষির উন্নয়ন সাধন করে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার লক্ষ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, ব্যবসাবাণিজ্য কাঠামো গড়ে তোলা, যোগাযোগ-পরিবহনের সুব্যবস্থা করা, নাগরিকদের সুশৃংখল জীবন নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা, জাতিকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, প্রয়োজনে যুদ্ধ পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করা ইত্যাদি এই রাষ্ট্র সংগঠনের কাজ।

নিঃসন্দেহে এই কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতোসব কাজ কাদের জন্য? নিশ্চয়ই মানুষের জন্য, মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য।

মানুষই যদি না থাকে এইসব কাজ করবে কে? আবার, মানুষের বর্তমান প্রজন্মের পর যদি আর কোন প্রজন্ম তৈরি না হয় তাহলে এইসব কাজ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সমাজ ও সভ্যতা মানুষের জন্য। আর মানুষই যদি না থাকে তাহলে সমাজ ও সভ্যতা টিকিয়ে রাখা এবং এইগুলোর শ্রীবৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

অর্থাৎ মানব বংশের ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত না হলে সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা একটি বেহুদা কাজ এবং কালের এক পর্যায়ে পৌঁছার পর এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

অন্য কথায় বলা যায়, সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে মানব বংশের ধারাবাহিকতা।

সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা তখনই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যখন মহিলাগণ তাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। গর্ভে সন্তান ধারণ, ভূমিষ্ঠ সন্তানকে স্তন্যদান, শিশুর লালন পালন, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাহচর্য দান এবং সন্তানদেরকে সমাজ ও সভ্যতার কর্ণধাররূপে সমাজ সংগনে প্রেরণ করে মহিলাগণ সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের পূর্বশর্ত পূরণ করে থাকেন।

জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ মহিলাদের জন্য এই মহান কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহিলাদের ওপর অর্পিত কর্তব্যকে ছোট মনে করে যাঁরা তাঁদেরকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে টেনে আনতে চান তাঁরা মহিলাদের ওপর মহামহিম আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত কর্তব্যের বড়ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সুক্ষ্মদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এবং আবেগ বিবর্জিত গভীর চিন্তা নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করলেই কেবল এর কল্যাণময়তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

৪. মহিলাদের ওপর বাইরের কাজ চাপানো মস্ত বড়ো যুল্‌ম

মাসিক ঋতুকালে মহিলাদের শরীরে তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়। রক্তচাপে তারতম্য ঘটে। হজম শক্তি ব্যাহত হয়। শ্বাস গ্রহণের শক্তি হ্রাস পায়। স্নায়ুমণ্ডলী অনেকাংশে অবসন্ন হয়ে পড়ে। স্মরণ শক্তি হ্রাস পায়। কাজে একাগ্রতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অংগ প্রত্যংগে বেদনা হয়। কারো কারো বমিবমি ভাব হয়। নাভীর নিম্নভাগে বেদনা হয়। অনেক সময় গলা শুকিয়ে আসে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।

গর্ভকাল মহিলাদের জন্য আরো বেশি কঠিন কাল। গর্ভবতী মহিলাদের দৈহিক ও মানসিক শ্রম করার শক্তি হ্রাস পায়। তাঁদের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁরা তখন কঠিন মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগেন। উদ্বেগ ও অস্থিরতার মধ্যে তাঁদের দিন কাটে। চিন্তা-গবেষণার শক্তি হ্রাস পায়। গর্ভকালের শেষ মাসটিতে মহিলাদের কোন প্রকার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম করার যোগ্যতা থাকে না।

সন্তান প্রসবের পরের সময়টিও বেশ নাজুক। এই সময় মহিলাগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। বেশ কিছুকাল কষ্টকর কোন কাজ করার মতো অবস্থা তাঁদের থাকে না।

স্তন্য দানের সময়টা তো এমন যে মহিলাগণ তখন সন্তানের জন্যেই যেন উৎসর্গীকৃত থাকেন। এই সময় তাঁদের শরীরের মূল্যবান উপাদান সন্তানের জন্য দুধে পরিণত হয়ে তাঁদের স্তনে এসে জমা হয়।

শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিপক্কতার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরী একমাত্র মায়ের দুধেই পাওয়া যায়।

শিশুর জন্য এমন খাবার প্রয়োজন যা বেশি গরম নয়, আবার বেশি ঠাণ্ডাও নয়। একমাত্র মায়ের দুধেই এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকে।

একমাত্র মায়ের দুধই বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত। মায়ের দুধ সহজপাচ্য। এটি পাকস্থলির হজমি রসের সংস্পর্শে এলে সহজেই ভেংগে যায়। ফলে জীবকোষগুলো তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

মায়ের দুধে ট্যারিন নামে যেই এমিনো এসিড থাকে তা শিশুর ব্রেইনের পরিপক্কতা সাধনে সাহায্য করে।

মায়ের দুধে থাকে পাইরিডক্সিন যা শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পরিপুষ্টি সাধন করে।

মায়ের দুধে বাইফিডো ব্যাকটেরিয়া নামক এক প্রকার রোগ প্রতিরোধী উপাদান থাকে যা আন্ত্রিক পরজীবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

স্টাফাইলোকক্কাই এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এর কারণে ফোঁড়া, জ্বর, মেনেনজাইটিস, নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ জন্মে। মায়ের দুধে একে প্রতিহত করার উপাদান থাকে। শিশুদেহে টনসিল প্রদাহ, কানের প্রদাহ, বাতজ্বর ইত্যাদি সৃষ্টি করে স্ট্রেপটোকক্কাই নামক জীবাণু। মায়ের দুধে থাকে এই জীবাণু প্রতিরোধী উপাদান ল্যাকটো পার অক্সিডেজ।

মায়ের দুধে যেই ইমুনো গ্লোবিন থাকে তা শিশুদেহে প্রবল রোগ-প্রতিরোধী শক্তি সৃষ্টি করে।

সন্তান প্রতিপালনের কয়েকটি বছর এমন কষ্টকর যে মহিলাদের জন্য রাতের ঘুম এবং দিনের বিশ্রাম হারাম হয়ে যায়।

মানব সন্তান পশু সন্তানের চেয়ে বেশি দুর্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার এবং স্বাবলম্বী হওয়ার যোগ্যতা একজন মানব সন্তান লাভ করে অনেক দেরিতে। মুখাপেক্ষিতার এই সময়টিতে প্রধানত মাকেই সন্তানের পাশে থাকতে হয় অতন্দ্র প্রহরীর মতো।

মানব শিশু যখন কথা বলার চেষ্টা করে তখন তার মুখে ভাষা দেয়ার দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়।

মানব সন্তান স্নেহ-মমতার কাঙাল। যেইসব সন্তান স্নেহ-মমতার উষ্ণতায় বেড়ে ওঠে তারা মানসিক ভারসাম্য অর্জন করে। সন্তানকে এই স্নেহ-মমতা দেয়ার জন্য প্রয়োজন মায়ের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য।

মাতৃত্বের দাবি পূরণ করা সহজ কোন ব্যাপার নয়। এটি মহিলাদের নিকট অনেক সময়, চিন্তা-ভাবনা ও পরিশ্রম দাবি করে।

মাতৃত্বের দাবি পূরণ এবং পরিবার পরিসরের বহুবিধ কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সময়, শ্রম এবং মেধা নিয়োজিত করার পরও মহিলাদের ওপর বাইরের কাজের বোঝা চাপানো ইনসাফ নয়, বরং যুলম। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা এই যুলম থেকে মহিলাদেরকে বাঁচাবার জন্যই গৃহকেন্দ্রিক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আপন প্রতিভা বিকাশের দিকে আগ্রহী হতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৫. মহিলাদের সার্বক্ষণিক বাইরের কাজ মাতৃত্বের অবসান দাবি করে

মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে মানব সন্তানকে এক বিস্ময়কর অবস্থায় রাখেন। পানির মধ্যে ডুবে থাকে বলে শিশু মায়ের চলাফেরার ঝাঁকুনি টেরই পায় না। মায়ের হৃদপিন্ডের ছন্দময় শব্দ তাকে আবিষ্ট করে রাখে। বাইরের ঝড়ো হাওয়া, তীব্র শীত কিংবা গরম তাকে বিরক্ত করতে পারে না। মাতৃগর্ভে শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় না। মুখে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। তাকে মলত্যাগও করতে হয়না। মাতৃগর্ভে শিশু বেশ আরামদায়ক পরিবেশেই থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই সে প্রবেশ করে এক অস্বস্তিকর পরিবেশে। তাকে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। ঠাণ্ডা তাকে কষ্ট দেয়। পরিবেশের এই ভিন্নতার কারণে সে কেঁদে ওঠে। এমতাবস্থায় মা তাকে কোলে তুলে নিলে মায়ের দেহের উষ্ণতা এবং বুকের স্পন্দন শিশুকে আশ্বস্ত করে তোলে। সে আবার শান্ত হয়। এই কারণে নবজাত শিশুকে মা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ঠিক নয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাতৃস্তনে শিশুর জন্য দুধ জমা করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই শিশুকে স্তন চুষতে দিতে হয়। প্রথম কয়েকদিন মায়ের দুধ ঘন ও হলদে থাকে। এই দুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারি। এই দুধ শিশুর দেহে রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা সৃষ্টি করে। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিদিন তাকে ১৫/২০ বার স্তন্য দিতে হয়।

নবজাত শিশুর ব্রেইন অপরিপক্ক থাকে। তখন ব্রেইনের তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি থাকে খুবই দুর্বল। শিশুর দেহটি থাকে কোমল। দেহে ঘামগ্রন্থি থাকে কম। ফলে তাপ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা থাকে। শিশুর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। তার রক্তের গ্লুকোজ কমে যায়। কোষকলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সবকিছুর প্রতিকার হচ্ছে শিশুকে বেশি বেশি মায়ের কোলে রাখা।

মাতৃত্বের প্রধান কাজ সন্তান গর্ভে ধারণ।

সন্তান গর্ভে ধারণের পর আসে সন্তান প্রসব এবং সন্তানকে স্তন্যদানের পালা। এইগুলো এমন কঠিন কাজ যা আঞ্জাম দেয়ার পর মহিলাদের পক্ষে বহির্মুখী

হওয়া সুকঠিন। তাই যেই সমাজ মহিলাদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে বাইরের কাজে দেখতে চায় সেই সমাজ মাতৃত্বের অবসানের জন্য গর্ভরোধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। অথচ গর্ভরোধ মোটেই কোন সুখকর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা নয়। গর্ভরোধের জন্য যেইসব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেইগুলো মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

সন্তান জন্মানোর জন্য প্রয়োজন পুরুষের শুক্রকীট এবং মহিলার পরিপক্ক ডিম। পুরুষের অণ্ডকোষের ভেতর থাকে শুক্রাশয়। এতে উৎপন্ন হয় শুক্রকীট। দুই পাশের দু'টি নালি দিয়ে শুক্রকীট ওঠে আসে ওপরের দিকে। একজন মহিলার তলপেটের দুই পাশে থাকে দুইটি ওভারী বা ডিম্বাশয়। ওভারীতে প্রতি মাসে একবার ডিম উৎপন্ন হয়। প্রতি মাসে কয়েক হাজার ডিম উৎপন্ন হলেও পাকা ডিম উৎপন্ন হয় একটি, কদাচিৎ দুইটি।

একজন মহিলার তলপেটের মাঝখানে থাকে জরায়ু বা বাচ্চাথলি। এই থলির দুই পাশে থাকে দুইটি সরু নালি। এইগুলোকে বলা হয় ডিম্বনালি। এই নালি দুইটির শেষ প্রান্তে বড়শির মতো কিছু আংটা থাকে। ডিম ওভারীর বাইরে এলেই আংটাগুলো ডিমগুলোকে ধরে নালি বা টিউবে ঢুকিয়ে দেয়।

যৌন মিলনের সময় পুরুষ তার স্ত্রীর গোপন অংগে বিশ থেকে ত্রিশ কোটি শুক্রকীট ঢেলে দেয়। এরা সামনের দিকে ছুটতে থাকে আর খুঁজতে থাকে পাকা ডিম। শুক্রকীটগুলোর মধ্যে যেইটি সবচে' বেশি বলবান সেইটি ডিমের অবস্থানস্থল নালি বা টিউবে ঢুকে পড়ে। শুক্রকীটটি সেখানে ঢুকে পাকা ডিমটির সাথে মিলিত হওয়ার সাথে সাথেই নালির মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে তৈরি হয় জাইগট বা ভবিষ্যত ভ্রূণ।

গর্ভধারণের এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করাই গর্ভরোধকের কাজ। পুরুষের শুক্রকীট এবং মহিলার ডিম যাতে একে অন্যের সাক্ষাত পেতে না পারে সেই জন্য অন্তরাল দিয়ে এদেরকে আলাদা করে রাখা হয়। গর্ভরোধের এই পদ্ধতিকে বলা হয় মেকানিকেল কনট্রাসেপটিভস। কপাটিকা, ডায়াফ্রাম ইত্যাদি এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। আবার, বিষাক্ত জিনিষ ব্যবহার করে শুক্রকীটগুলোকে মেরে ফেলা হয়। গর্ভরোধের এই পদ্ধতিকে বলা হয় কেমিকেল কনট্রাসেপটিভস। বড়ি, জেলি ইত্যাদি এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি অপারেশনের মাধ্যমে বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে।

মেকানিকেল কন্ট্রাসেপটিভস ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এইগুলো দিনের পর দিন একজন মহিলার বাচ্চাথলির মুখে আঁচড় বসাতে থাকে। এইভাবে বাচ্চা থলির দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

গর্ভরোধক বড়িগুলো হরমোন দিয়ে তৈরি। এইগুলো বেশি দিন খেলে মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমি বমি ভাব হয়। বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। স্তনে বেদনা হয়। দেহে চর্বি জমে। লিভারের কাজ বিঘ্নিত হয়। ফলে জণ্ডিস দেখা দেয়। হার্টের রোগ সৃষ্টি হয়। ক্যান্সারের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। ফোম বড়ির বেশি বেশি ব্যবহার গোপন অঙ্গে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে।

একজন মহিলাকে বন্ধ্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর ডিম্বনালি দুইটি কেটে কর্তিত প্রান্তগুলো সূতো দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। এতে ওভারীতে উৎপন্ন ডিম্বগুলো বাচ্চাথলির দিকে এগুতে পারে না। এই অপারেশনের ফলও সুখকর নয়। মহিলাদের মাসিক ঋতুতে গোলমাল দেখা দেয়। তাঁর দেহ মোটা হয়ে যায়। বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

গর্ভরোধক ব্যবহার করার পরও গর্ভধারণের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে না। তাই দেখা যায়, গর্ভরোধক ব্যবহারের পরও গর্ভে সন্তান এসে গেছে।

এমতাবস্থায় অনাকাংখিত সন্তানের আগমন প্রতিহত করার জন্য যা করা হয় তার নাম এবোরশান বা গর্ভপাত। আর গর্ভপাত একজন মহিলার স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মোটকথা, মহিলাদের সার্বক্ষণিক বাইরের কাজ মাতৃত্বের অবসান দাবি করে। আর মাতৃত্বের অবসানের জন্যে যেইসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা তাঁদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তদুপরি এই পদক্ষেপ মহান আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনায় নগ্ন হস্তক্ষেপ বিধায় তা অনৈতিকও বটে।

৬. মহিলাদের প্রতি গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে বলেন, "ওহে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ মহিলাদের মতো নও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না। এতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে। বরং সোজাসোজা ও স্পষ্ট কথা বল।" সূরাহ আল আহযাব ।। ৩২

"তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহিলী যুগের মতো তাবাররুজ করে বেড়িয়োনা। সালাত কায়েম কর। যাকাত দাও। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ চান যে তোমাদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে পবিত্র করে দেবেন।" সূরাহ আল আহযাব ।। ৩৩

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যদিও মহানবীর (সা) স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে আসলে সেইগুলো সকল মুমিন মহিলার জন্যই প্রদত্ত।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রথমেই নবীপত্নীগণকে মর্যাদা ও পবিত্রতার উচ্চতম আসনে সমাসীন করে তাঁদেরকে সমগ্র মুসলিম মহিলাকুলের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণে পরিণত করেছেন।

আল্লাহর রাসূলের (সা) পত্নীদের দ্বারা কোন কাজের সূচনা হলে অন্যান্য মুসলিম পরিবারের মহিলাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁদের অনুসরণ করবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মহিলাদের জন্য তিনটি খাস নির্দেশ পাওয়া যায়। যথা ঃ এক. কোমল কণ্ঠে ভিন্ পুরুষের সাথে কথা না বলা। দুই. গৃহে অবস্থান করা। তিন. প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তাবাররুজ না করা।

আল হাদীসেও আমরা এইসব নির্দেশের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মহিলা অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকার যোগ্য। যখন সে ঘরের বাইরে যায় শাইতান তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে আল্লাহর রাহমাতের নিকটবর্তী তখনই হতে পারে

যখন সে আপন গৃহে অবস্থান করতে থাকে।” আল জামে’ আত তিরমিযী, বায্‌যার

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, “আল্লাহর কাছে একজন মহিলার সেই সালাতই বেশি পছন্দনীয় যা সে গৃহের অন্ধকার কক্ষে আদায় করে।” তাবারানী

উম্মু হুমাইদ সায়েদীয়া (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পেছনে সালাত আদায় করতে আমার বড়ো আগ্রহ।” তিনি বললেন, “তোমাদের নিজেদের কক্ষে সালাত আদায় করা বহির্বাটিতে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম, তোমাদের বহির্বাটিতে সালাত আদায় করা তোমাদের মহল্লার মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম। আর তোমাদের মহল্লার মাসজিদে সালাত আদায় করা জামে মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।” অতপর উম্মু হুমাইদ তাঁর গৃহের নিভৃততম কক্ষটিকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই সালাত আদায় করেন।’ আহমাদ ও তাবারানী

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী (সা) বলেছেন, “মহিলাদের সর্বোত্তম মাসজিদ হচ্ছে তাদের গৃহের নিভৃততম কক্ষ।” আহমাদ, তাবারানী

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, “তোমাদের মহিলাদেরকে মাসজিদে আসতে নিষেধ করো না, যদিও তাদের গৃহই তাদের জন্য অধিক উত্তম।” মুসনাদে আহমাদ, সুনানু আবী দাউদ

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক মহিলা আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট এসে বললেন, “সব পুণ্য ও মর্যাদা তো পুরুষরাই লুটে নিচ্ছে, জিহাদে তারাই যায়, আল্লাহর পথে বড়ো বড়ো কাজ তারাই করে, আমরা এমন কি কাজ করতে পারি যাতে মুজাহিদদের সমতুল্য পুণ্যের অধিকারী হতে পারি?” আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, “তোমাদের মধ্যকার যেই মহিলা গৃহে স্থির হয়ে থাকবে সে মুজাহিদ পুরুষের আমলের সমান পুণ্য পাবে।” আবু বাকর বায্‌যার

আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, মহিলাদের ওপর কি জিহাদ ফারয?” অল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, “হাঁ। তাদের ওপরও জিহাদ ফারয। তবে তাতে হত্যাকাণ্ড নেই। আর সেটি হচ্ছে হাজ্জ ও উমরাহ।” সুনানু ইবনু মাজাহ

আল্লাহর রাসূল (সা) আয়িশাহকে (রা) বললেন, "তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে অবস্থান করা। এটাই তোমাদের জিহাদ।" মুসনাদে আহমাদ

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "নারী তার স্বামীর গৃহের লোকদের এবং তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। তাদের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিতা হবে।" সহীহ আল বুখারী

গৃহকেন্দ্রিক কাজের জন্য সৃষ্টিগত বিশিষ্টতা ও উপযুক্ততার কারণেই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) মহিলাদেরকে গৃহে অবস্থান করে তাঁদের ওপর অর্পিত কর্তব্যসমূহ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহিলাগণ যাতে গৃহকেন্দ্রিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন এবং এই কাজগুলোতে বেশি বেশি সময় দিতে পারেন সেইজন্য ইসলাম তাঁদেরকে বাইরের অনেক কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

নিজেদের রুজিরোজগারের পেরেশানি থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করা হয়েছে। স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণ পোষণ ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে পুরুষদের ওপর। মহিলাদের ওপর এই বাধ্যবাধকতা নেই।

জুমাবারে সালাতুল জুমুআ পুরুষদের জন্য ফারয। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা ফারয করা হয়নি।

সালাতুল জানাযাতে শরীক হওয়া, মৃতব্যক্তির কবর খনন, কাফনদাফন ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব নেই মহিলাদের। কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে পুরুষদের ওপর।

পরিবার সদস্যদের জন্য অর্থোপার্জনের গুরু দায়িত্ব পুরুষদের ওপর অর্পিত। এই কঠিন বোঝা চাপানো হয়নি মহিলাদের কাঁধে।

রাষ্ট্রপরিচালনার জটিল কাজ পুরুষদের ওপর চাপানো হয়েছে। মহিলাদেরকে দেয়া হয়েছে অব্যাহতি।

দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। আর যুদ্ধ বড্ড কঠিন এক কাজ। এটি একদিকে দাবি করে কঠিন মেহনত, অন্যদিকে দাবি করে রক্ত। মহান আল্লাহ এই কঠিন কাজ পুরুষদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। অব্যাহতি দিয়েছেন মহিলাদেরকে।

৭. মহিলাদের বাইরের কাজে অংশগ্রহণের পক্ষে একটি খোঁড়া যুক্তি

মুসলিম মহিলাদের গৃহের বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সবচে' বড়ো যুক্তি দেখানো হয় যে আয়িশাহ (রা) জামাল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফানের (রা) হত্যার সময় নবী পত্নীগণ হাজ্জ উপলক্ষে মাক্কায় ছিলেন।

দুঃখজনক খবর শুনে অন্যরা ফিরে আসেন। আয়িশাহ (রা) আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে বাসরার দিকে রওয়ানা হন। শেষাবধি তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

সামগ্রিকভাবে আসহাবে রাসূল এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) অন্যান্য পত্নীগণ তাঁর এই ভূমিকা সমর্থন করেন নি।

নবীপত্নী উম্মু সালামাহ (রা) আয়িশাহকে (রা) একটি হৃদয়গ্রাহী চিঠি পাঠান। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেন,

"আপনি আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তাঁর উম্মাতের মাঝে দ্বার স্বরূপ। আপনি এক পর্দা যা নবীর অন্তঃপুরে লটকানো হয়েছে। আল কুরআন আপনার পরিধিকে সংযত এবং সংকুচিত করেছে, তা আপনার সম্মান হিফাজাত করেছে। আপনি তা প্রসারিত করবেন না। যদি আল্লাহর রাসূল অবগত থাকতেন যে নারীদের ওপরও জিহাদের দায়িত্ব রয়েছে তিনি আপনাকে ওয়াসীয়াত করতেন। আপনার কি জানা নেই যে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনাকে বিভিন্ন নগরে শহরে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন? কেননা ইসলামের খুঁটিগুলো দোলায়মান ও কম্পমান হতে থাকলে নারীদের দ্বারা সেইগুলো স্থির ও সুদৃঢ় হতে পারে না। যদি তাতে ফাটল ধরে তবে নারীদের দ্বারা তা ভরাট করা সম্ভব হয় না। নারীদের জিহাদ হলো দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজকে সংযত রাখা, ছোট কদমে চলা। আপনি যেই মরুময়দানে এক ঘাঁটি থেকে আরেক ঘাঁটির দিকে আপনার উষ্ট্রীকে দৌড়াচ্ছেন যদি সেখানে আল্লাহর রাসূল আপনার সামনে এসে পড়তেন আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন? কাল আপনাকে রাসূলের নিকট যেতে হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি

আমাকে বলা হয় 'হে উম্মু সালামাহ, জান্নাতে চলে যাও'--তবুও যেই পর্দা আমার ওপর তিনি আরোপ করে গেছেন তা ছিন্নভিন্ন করে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে আমি লজ্জাবোধ করবো। অতএব আপনি একে আপনার পর্দা বানান। আপন গৃহের চৌহদ্দীকে আপন দুর্গ মনে করুন। কেননা যতদিন আপনি আপন গৃহে থাকবেন ততদিনই এই উম্মাহর সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী হবেন।" আল আকদুল ফরীদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৬

যায়িদ ইবনু সাওবান (রা) আয়িশাহকে (রা) এক চিঠিতে লিখেন, "আপনাকে এক কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আরেক কাজের। আপনার প্রতি নির্দেশ হলো, আপন গৃহে অবস্থান করুন, আর আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা মিটে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাই। আপনি আপনার কাজ ছেড়ে দিলেন, আর আমরা যেই কাজের জন্য আদিষ্ট, তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।" ইমাম আবুল ফদল ইবনু তাহের, আল আকদুল ফরীদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৭

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবী তালিব (রা) আয়িশাহকে (রা) লিখেছিলেন, "আপনার এই পদক্ষেপ ইসলামী শারীয়াহর সীমালংঘনকারী হয়েছে।"

যুদ্ধ শেষে আলী (রা) আয়িশাহকে (রা) বলেছিলেন, "আল্লাহ আপনাকে আপন গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আপনি বেরিয়ে এসেছেন যুদ্ধ করতে।"

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেছেন, "এই কথা স্মরণ করতে হবে যে আয়িশাহর (রা) জন্য তাঁর গৃহ তাঁর উটের পিঠের আসনের চেয়ে উত্তম।"

পরবর্তীকালে আয়িশাহ (রা) তাঁর এই কাজের জন্য অনুতপ্ত হন।

আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল যাওয়ায়েদুজ জুহদ কিতাবে, ইবনুল মুনযির, ইবনু আবী শাইবাহ এবং ইবনু সা'দ তাঁদের গ্রন্থে মাসরুক থেকে বর্ণনা করেছেন যে আয়িশাহ (রা) আল কুরআন পড়তে পড়তে যখন "ওয়াকারনা ফী বুয়ুতিকুন্না" পর্যন্ত আসতেন তখন অদম্য বেদনায় কেঁদে ফেলতেন। তাঁর বুকের কাপড় চোখের পানিতে ভিজে যেতো।

যেই কাজের জন্য আয়িশাহ (রা) জীবনের বাকি অংশ অনুশোচনা করে গেছেন সেই কাজকে মহিলাদের বাইরের কাজে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা একেবারেই অযৌক্তিক।

৮. আল হিজাব বা পর্দা সমাজ জীবনের পবিত্রতার গ্যারান্টি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে এমন প্রবণতা দান করেছেন যে তারা একে অপরের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। তবে মহিলাদের দৈহিক সৌন্দর্য পুরুষদেরকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে। কোন মহিলার সৌন্দর্য যখন একজন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে তখন সেই মহিলাকে পাওয়ার জন্য পুরুষটি পাগলপারা হয়ে ওঠে। সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ সবলদেহী। আবার কাংখিত বস্তু লাভের জন্য ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতাও তার মাঝে প্রবল। কোন মহিলার সৌন্দর্য যখন তার মন কেড়ে নেয় তখন সেই মহিলাকে পাওয়ার জন্য সে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। কোন সমাজের পুরুষগণ যদি মহিলাদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে যৌন সাথী হিসাবে পাওয়ার জন্যে পাগলপারা হয়ে ওঠে তাহলে সমাজ জীবনে অপবিত্রতার মহা প্লাবন সৃষ্টি হওয়াই তো স্বাভাবিক। অথচ বৈবাহিক গণ্ডির বাইরে যৌনতা সম্প্রসারিত হোক এটা মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় নয়। তাই সমাজ জীবনের পবিত্রতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল হিজাব বা পর্দার বিধান নাযিল করেছেন।

৮.১ আওরাহ এবং আল হিজাবের পার্থক্য

আওরাহ অর্থ ফাঁক, বিপদের স্থান, অরক্ষিত জিনিষ, যা প্রকাশিত হওয়া অনভিপ্রেত, সেই স্থান যা উন্মুক্ত হওয়া লজ্জার কারণ।

আওরাহ্র আরেক নাম সতর।

(ক) আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান পুরুষের আওরাহ।" দারু কুতনী, বাইহাকী

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "নিজের স্ত্রী কিংবা দাসীর নিকট ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের হিফাজাত কর।" সুনানু আবী দাউদ, আল জামে' আত তিরমিযী, সুনানু ইবনু মাজাহ

পুরুষ দেহের আওরাহ বা সতর আপন স্ত্রী কিংবা দাসী ছাড়া অপর কারো সম্মুখে উন্মুক্ত করা হারাম।

(খ) কবজি থেকে শুরু করে হাতের অগ্রভাগ এবং চেহারা ব্যতীত দেহের সকল অংশ একজন মহিলার আওরাহ।

এই অংশগুলো স্বামীছাড়া অপর কোন পুরুষের এমনকি আপন পিতা ও ভাইয়ের সামনেও খোলা রাখা নিষেধ।

আয়িশাহ (রা) বলেন যে, তাঁর বোন আসমা বিনতু আবী বাকর (রা) একবার খুব পাতলা পোষাক পরা অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, "হে আসমা, কোন মহিলা যখন বালেগা হয় তখন তার চেহারা ও হাতের অগ্রভাগ ব্যতীত দেহের অন্য কোন অংশ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।" সুনানু আবী দাউদ

তবে পিতা ও ভাইয়ের সামনে একজন মহিলা দেহের এতোটুকু অংশ প্রকাশ করতে পারে যা কাজ কর্ম করার জন্য প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন, আটা তৈরির সময় কামিসের আস্তিন গুটিয়ে রাখা কিংবা ঘর ধোয়ার সময় পরনের কাপড় কিছুটা ওপরে ওঠানো।

(গ) একজন মহিলার নিকট অপর জন মহিলার আওরাহ হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান। অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান অপর মহিলার সামনে ঢেকে রাখা ফারয। আর অন্যান্য অংশ ঢেকে রাখা ফারয নয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে একজন মহিলা অপর মহিলার সামনে অর্ধ-উলংগ হয়ে থাকবে।

একজন মহিলা তার দেহের যতোটুকু অংশ মুহাররাম পুরুষের সামনে খোলা রাখতে পারে সেইটুকুও গায়রে মুহাররাম পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখার নামই আল হিজাব।

৮.২ পর্দার নির্দেশ

হিজরী পঞ্চম সনের যুলকাদা মাসে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) সাথে বিয়ে হয় যায়নাব বিনতু জাহাশের (রা)।

এই বিয়ের ওয়ালীমাহর বর্ণনা দিতে গিয়ে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, "রাতে ছিলো ওয়ালীমাহর দাওয়াত। লোকেরা খাওয়া শেষে চলে গেলো। দুই তিনজন লোক ঠায় বসে থেকে খোশগল্প করতে থাকে। আল্লাহর রাসূল (সা) অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি বেগমদের ঘর ঘুরে আসেন। ফিরে এসে দেখেন লোকগুলো তখনও বসে আছে। তিনি আবার ভেতরে চলে যান এবং আয়িশাহর (রা) ঘরে গিয়ে বসেন। বেশ রাত হওয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে লোকগুলো চলে গেছে।"

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেই বিধান নাযিল করেন তাতে বলা হয়, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। এসে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকো না। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, প্রবেশ কর। কিন্তু খাওয়া শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়। কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা। তোমাদের এইরূপ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে লজ্জায় কিছু বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। নবীর পত্নীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতার জন্য উত্তম। তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেবে তা তোমাদের জন্য জায়েয হতে পারে না, না তাঁর অবর্তমানে তাঁর পত্নীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য জায়েয। তোমাদের এই আচরণ আল্লাহর নিকট অতি বড়ো গুনাহ।"

"তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ সবকিছুই জানেন।" "তাদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, বোনপো, তাদের সাধারণ মেল্যমেলার স্ত্রীলোকগণ এবং তাদের ক্রীতদাস আসা-যাওয়া করবে, এতে কোন দোষ নেই। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ সবকিছুর ওপর দৃষ্টিবান।" সূরাহ আল আহযাব।। ৫৩-৫৫

"তাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে"--এই নির্দেশ আসার পর আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদের গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। আর নবীর (সা) পদাংক অনুসরণ করে নবীর (সা) অনুসারীগণও তাদের গৃহের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেন।

এক শ্রেণীর লোক বলে থাকেন যে সূরাহ আল আহযাবের আয়াতাংশ (যার অর্থ ঃ তোমরা তাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে) নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের জন্য এই নির্দেশ নয়।

এই অভিমতটিকে সঠিক বলে মেনে নেবার কোন সুযোগ নেই। কারণ--

(ক) উম্মু আতীয়্যাহ (রা) বলেন, "আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহার দিন যুবতী অন্তঃপুরবাসিনী ও হায়েজ সম্পন্না মহিলাদেরও বের করে নিতে নির্দেশ দেন।" সুনানু ইবনু মাজাহ

এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর রাসূলের (সা) যুগে মুসলিম মহিলাগণ আল হিজাবের নির্দেশ পালনার্থে সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করতেন।

(খ) একদিন আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা) আল্লাহর রাসূলের নিকট এলেন। (ইনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী মুয়ায ইবনু জাবালের ফুফাতো বোন)। তিনি বললেন, "আমি আমার পশ্চাতে অবস্থিত মুসলিম মহিলা দলের পক্ষ থেকে প্রেরিত। তারা সকলে আমার কথার সাথে একমত, এবং আমিও তাদের মতই প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'লা আপনাকে পুরুষদের প্রতি এবং মহিলাদের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসরণ করে চলছি। কিন্তু আমরা মহিলাকুল অন্তঃপুরবাসিনী, হাওদায়ে উপবেশনকারিণী, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানকারিণী। আমরা পুরুষের লালসার কেন্দ্রস্থল এবং আমরা তাদের সন্তানরূপ বোঝা বহন করি। জুমুআ, সালাতুল জানাযা এবং জিহাদে শরীক হওয়ার অধিকার পেয়ে পুরুষগণ আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা যখন জিহাদে চলে যায় আমরা তাদের সম্পদ সংরক্ষণ করি এবং তাদের সন্তানদের লালন পালন করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই অবস্থায় আমরা কি তাদের সাওয়াবের অংশ পাবো?" আল্লাহর রাসূল (সা) উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কি কোন মহিলাকে দীনী ইলম হাসিলের জন্য এর চেয়ে ভালোভাবে প্রশ্ন করতে পেরেছে বলে জানো?" তাঁরা আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, "না, হে আল্লাহর রাসূল।"

অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসমা বিনতু ইয়াযীদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "হে আসমা, তুমি আমার সহযোগিতা কর। যেইসব মহিলা তোমাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও যে ভালোভাবে গৃহের কাজ করা, স্বামীদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে মিলমিশ রক্ষার্থে তাদের কথা মেনে চলা, পুরুষদের যেইসব কাজের কথা তুমি উল্লেখ করলে সেইগুলোর মর্যাদার সমান।"

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জবাব শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করতে করতে ওঠে চলে গেলেন।" আল ইসতীয়াব, ইবনু হাজার আল আসকালানী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭০৬

এই ঘটনাও আল্লাহর রাসূলের (সা) যুগে মুসলিম মহিলাদের জীবনধারার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছে।

(গ) আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের পোষাক পরতে আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন?" নবী (সা) বললেন, "কামিস, পাজামা, পাগড়ি ও

দস্তানা পরবে না। যার জুতা নেই সে মোজা পরবে এবং গোড়ালির নীচে কেটে ফেলবে। জাফরান বা ওরারস লাগান হয়েছে এমন কাপড় পরবে না। আর ইহরাম বাঁধা মহিলাগণ চেহারায় নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরবে না।" সহীহ আল বুখারী

মহিলা সাহাবী ফাতিমা বিনতু মানযার (রা) বলেন, "আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখতাম। আমাদের সাথে আসমা বিনতু আবী বাকরও ছিলেন।" সহীহ আল বুখারী

ফাতিমা বিনতু মানযার (রা) নবীপত্নী ছিলেন না। তবে তিনি একজন সতর্ক মহিলা ছিলেন। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং তাঁর সংগিনীগণ চেহারা ঢেকে রাখতেন। আর অন্যান্য সময় যে তাঁরা চেহারা ঢেকে চলাফেরা করতেন তা বলাই বাহুল্য।

(ঘ) অতীতকালেও মুমিন মহিলাদের জীবনধারা অনুরূপ ছিলো বলে আল কুরআনে ইংগিত পাওয়া যায়।

আল কুরআনে রয়েছে, "ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কথা তোমার নিকট পৌছেছে কি? তারা যখন তার নিকট প্রবেশ করলো বললো, "আপনাকে সালাম।" সে বললো, "আপনাদেরকেও সালাম।" অপরিচিত লোক ওরা। পরে সে চুপচাপ তার ঘরের লোকদের নিকট গেলো এবং (ভুনা করা) মোটাতাজা বাছুর নিয়ে এসে তাদের সামনে রাখলো। (তারা খাচ্ছেনা দেখে) সে বললো, "আপনারা খাচ্ছেন না?" সে এদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলো। তারা বললো, "ভয় পাবেন না।" এবং তারা একজন জ্ঞানবান পুত্রের জন্ম সম্পর্কে তাকে সুসংবাদ দিলো। এই কথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসলো ....।" আয্ যারিয়াত।। ২৪-২৯

এই ঘটনা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে লুতের (আ) পাপাচারী জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একদল ফিরিশতা আসেন। লুতের (আ) জাতির এলাকায় যাবার পথে তারা ইবরাহীমের (আ) বাসস্থানে পৌছেন।

ফিরিশতাগণ এসেছিলেন মানুষের আকৃতিতে। ইবরাহীম (আ) একটি ভুনা বাছুর তাঁদের সামনে হাজির করেন। তাঁরা খাচ্ছেন না দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং ভাবেন যে এঁরা নিশ্চয়ই কোন বিপদ নিয়ে এসেছেন। ফিরিশতাগণ তখন তাঁদের

পরিচয় এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ইবরাহীমকে (আ) অবহিত করেন। তাঁরা জানান তাঁরা তাঁকে এই সুসংবাদ দিতে এসেছেন যে তাঁর নিঃসন্তান বৃদ্ধা স্ত্রী সারাহ-র গর্ভে একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম হবে ইসহাক।

ইবরাহীমের (আ) স্ত্রী এতোক্ষণ মেহমানদের সামনে আসেননি। যখন তিনি জানলেন যে এরা মানুষ নন, ফিরিশতা এবং তাঁরা তাঁদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন তখন তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ান। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইবরাহীমের (আ) স্ত্রী ভিন্ পুরুষের সাথে পর্দা করতেন।

আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "সে (মূসা) যখন মাদইয়ানে পানির কূপের নিকট পৌঁছলো, দেখলো বহুলোক নিজেদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের থেকে আলাদা হয়ে দুইজন মহিলা নিজেদের জন্তুগুলোকে আগলে রেখেছে। মূসা এই দুই মহিলার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কি অসুবিধা?" তারা বললো, "আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণ না এই রাখালরা তাদের জন্তুগুলোকে নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের আব্বা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।" সূরাহ আল কাসাস।। ২৩

পরে "এই দুইজন মহিলার একজন লজ্জা-শালীনতা সহকারে এসে বললো, "আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন। তিনি আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন।" সূরাহ আল কাসাস ।। ২৫

এই দুইজন মহিলা দীনদার মুত্তাকী ছিলেন বলে পুরুষদের সাথে ঠেলাঠেলি করে তাঁদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে অগ্রসর হননি। তাঁদের পরিবারে অচল বৃদ্ধ আব্বা ছাড়া আর কোন পুরুষ ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে তাঁদেরকে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে। আব্বা প্রতিদান দেবার জন্য মূসাকে (আ) ডেকে নিতে যেই মহিলাকে পাঠান তিনি লজ্জা-শালীনতা সহকারে মূসার (আ) নিকটবর্তী হন।

এই প্রসংগে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "সে লজ্জাশরমে ভারাক্রান্ত অবস্থায়, তার চেহারায় নিকাব দিয়ে এসেছিলো। ওদের মতো নয় যারা চারদিকে বের হয় এবং সবখানে গিয়ে প্রবেশ করে।"

সায়ীদ ইবনু মানসুর, ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতিম এবং ইবনুল মুনযির উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। এইগুলোতে উমার (রা) স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে ভিন্ পুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা

মহিলাদের লজ্জাশীলতার নিদর্শন। আর ভিন্ পুরুষের সামনে চেহারা খুলে রাখা চরম লজ্জাহীনতা। তাফহীমুল কুরআন, সূরাহ আল কাসাস, টীকা-৩৫

৮.৩ ঘরের প্রাইভেসি নিশ্চিত করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ আল্ কুরআনে বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, নিজদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করবে না যেই পর্যন্ত ঘরের লোকদের সন্তুষ্টি না পাবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে।"

"সেখানে যদি কাউকে না পাও তবে ঘরে প্রবেশ করবে না যেই পর্যন্ত না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি বলা হয় 'ফিরে যাও' ফিরে যাবে। এটি তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা ভালো করে জানেন।"

"অবশ্য কারো বসবাসের স্থান নয় অথচ সেখানে তোমাদের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে এমন ঘরে প্রবেশ করতে দোষ নেই। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর আর যা কিছু গোপন কর সব বিষয় আল্লাহ জানেন।" সূরাহ আন্ নূর ।। ২৭-২৯।

আল্লাহর রাসূল (সা) অপরের ঘরের দিকে তাকানোকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) আযাদ করে দেয়া গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেন যে নবী (সা) বলেছেন, "চোখই যদি ভেতরে চলে গেলো তাহলে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার কি অর্থ হতে পারে?" সুনানু আবী দাউদ।

হুযাইল ইবনু শুরাহবীল (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবীর (সা) ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। নবী (সা) বললেন, "সরে দাঁড়াও। অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ তো এই জন্য যাতে ভেতরে চোখ না পড়ে।" সুনানু আবী দাউদ

নবী (সা) বলেছেন, "কেউ তোমার ঘরের দিকে উঁকি মারলে তুমি যদি কংকর মেরে তার চোখ নষ্ট করে দাও এতে তোমার দোষ হবে না।" সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, একব্যক্তি বাইরে থেকে নবীর (সা) ঘরের ভিতরের দিকে তাকালো। নবীর (সা) হাতে একটি তীর ছিল। তিনি লোকটির দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেলেন যে মনে হচ্ছিলো তিনি সেটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন।

কেবল অপরের ঘরেই নয়, নিজের মা ও বোনদের ঘরে প্রবেশ করতে হলেও পূর্ব অনুমতি নেয়ার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে।

৮.৪ মায়ের ঘরের প্রাইভেসি নিশ্চিত করার নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের মালিকানাধীন লোক এবং তোমাদের সেইসব বালক যারা এখনও বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছায়নি তিনটি সময়ে যেন তোমাদের কক্ষে অনুমতি নিয়ে আসে। সালাতুল ফজরের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রাখ এবং সালাতুল ইশার পর। এই তিনটি তোমাদের আওরাত। এরপর বিনানুমতিতে এলে তোমাদের দোষ হবে না, না তাদের। তোমাদেরকে তো একে অপরের কাছে বারবার আসা-যাওয়া করতে হয়। এইভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করে থাকেন। তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী।"

"আর তোমাদের বালকেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছে তারা যেন তোমাদের কক্ষে আসে অনুমতি নিয়ে, যেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে বড়োরা। এইভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি জ্ঞানী ও সুকৌশলী।" সূরাহ আন্ নূর।। ৫৮, ৫৯

৮.৫ কতিপয় ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত মহিলাদের রূপ–সৌন্দর্য প্রকাশ না করার নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে বলেন, "(এবং তারা যেন) নিজেদের যীনাত (রূপ সৌন্দর্য) না দেখায় কেবল তা ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের যীনাত (রূপ-সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইপো, বোনপো, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাস, এমন সব অধীন পুরুষ যাদের অন্যরকম গরজ নেই এবং সেইসব বালক যারা মহিলাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল নয়--তাদের সম্মুখে ব্যতীত।

আর তারা নিজেদের পা যমীনে মেরে এমনভাবে চলাফেরা করবে না যাতে তারা যেই যীনাত গোপন করে রেখেছে তা লোকেরা জানতে পারে।

হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" সূরাহ আন্ নূর।। ৩১

উপরোক্ত আয়াতের "কেবল তা ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে" অংশটির ভিত্তিতে কেউ কেউ সাধারণভাবে চেহারা এবং হাতের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয মনে করেন।

"যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে" আয়াতাংশ সম্পর্কে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। প্রথম মত হচ্ছে "যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে" তা পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। চেহারা এবং হাতের তালু পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এইগুলো গায়ের মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলা রাখা যাবে না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে "যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে" তা চেহারা ও হাতের তালু। এইগুলো গায়ের মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলা রাখা যাবে।

তাফসীরকার মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেন, "চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল প্রথম মত গ্রহণ করে ফিতনার আশংকা থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই (গায়ের মুহাররাম পুরুষের সামনে) চেহারা ও হাত খোলা রাখার অনুমতি দেননি। ইমাম আযম আবু হানীফাহ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করলেও ফিতনার আশংকামুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। যেহেতু এই শর্ত পাওয়াটা স্বাভাবিক নয় সেহেতু হানাফী ফকীহগণ গায়ের মুহাররাম পুরুষদের সামনে মহিলাদের চেহারা ও হাত খোলা রাখার অনুমতি দেননি।" তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১৭, ২১৮

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় এই যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লিখেছেন, "প্রকাশিত হওয়া" এবং "প্রকাশ করা" এই দুইটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে "প্রকাশ করাকে" নিষেধ করেছে এবং "প্রকাশিত হওয়ার" ব্যাপারটিকে মাফ করেছে। এই মাফ করার সীমাকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত প্রসারিত করা আল কুরআনের বিপরীত, আবার আল হাদীসের সেইসব বর্ণনারও বিপরীত যেইগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর রাসূলের (সা) যুগে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মহিলাগণ চেহারা খোলা রেখে বাইরে চলাফেলা করতেন না। চেহারা আবৃত করাও পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইহরাম ছাড়া অন্য সব অবস্থায় মুখাবরণকে মহিলাদের পোষাকের একটি অপরিহার্য অংশ গণ্য করা হতো।"

৮.৬ যেইসব আত্মীয়ের সাথে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম নয় তাদের সাথে পর্দা

যেইসব আত্মীয়ের সাথে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম নয় মহিলাগণ অসংকোচে ও রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়ে তাদের সামনে আসতে পারে না। আবার, তারা পুরোপুরি ভিন্ পুরুষ নয় বিধায় ভিন্ পুরুষের সাথে করণীয় পুরোপুরি পর্দা

তাদের সাথে করাও অপ্রয়োজনীয়। এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে কিরূপ আচরণ করা উচিত শারীয়াহ তা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

ব্যক্তিদের অবস্থা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে আচরণ বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

উম্মুহানি বিনতু আবী তালিব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো বোন ছিলেন। তিনি চেহারা খোলা রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মুখে আসতেন।

অন্যদিকে, আল ফাদল ইবনুল আব্বাস (রা) এর ফুফাতো বোন ছিলেন নবীপত্নী যায়নাব বিনতু জাহাশ (রা)। যায়নাব (রা) পর্দার আড়াল থেকে আল ফাদলের সাথে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে আসতেন না।

৮.৭ বিগত যৌবনা মহিলাদের জন্য পর্দার শিথিলতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আর বসে থাকা মহিলাগণ যাদের বিবাহ করার আকাংখা নেই, যদি চাদর খুলে রাখে এতে তাদের দোষ হবেনা, অবশ্য যদি তারা রূপ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শনকারিণী না হয়। তারা যদি লজ্জাশীলতা রক্ষা করে তবে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন।" সূরা আন নূর।। ৬০

"বসে থাকা মহিলাগণ" অর্থ হচ্ছে বিগত যৌবনা মহিলাগণ যাঁদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই, যাঁদের যৌন বাসনা নেই এবং যাঁদেরকে দেখে পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হয়না। এঁদের মনে যদি রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনেচ্ছা না থাকে তবেই কেবল তাঁদের জন্য চাদর খুলে রাখার অনুমতি রয়েছে।

৮.৮ বিশেষ প্রয়োজনে পর্দার শিথিলতা

বিশেষ প্রয়োজনে পর্দার শিথিলতার অবকাশ রয়েছে ইসলামে। যেমন, দেহের রোগাক্রান্ত অংশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য রোগিণীর তা ডাক্তারের নিকট উন্মুক্ত করা জায়েয।

কোন বাদী, বিবাদী কিংবা সাক্ষীর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজনে একজন মহিলার বিচারকের সম্মুখে চেহারা উন্মুক্ত করা জায়েয।

কোন মহিলা আগুনে পুড়ছে অথবা পানিতে ডুবে যাচ্ছে দেখতে পেলে একজন পুরুষের পক্ষে তাকে কোলে করে তুলে আনা কেবল জায়েযই নয়, বরং ফারয।

৯. নবী–পত্নীদের পর্দা

৯.১ নবী–পত্নী যায়নাব বিনতু জাহাশের (রা) পর্দা

একবার আল ফাদল ইবনুল আব্বাস এবং আবদুল মুত্তালিব ইবনু রাবীয়া ইবনু হারিস নবী-পত্নী যায়নাবের (রা) ঘরে আসেন। যায়নাব (রা) ছিলেন আল ফাদলের ফুফাতো বোন। আবার, যায়নাব (রা) ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পিতা রাবীয়া ইবনু হারিসেরও ফুফাতো বোন। ঘরে নবীও (সা) উপস্থিত ছিলেন। যায়নাব পর্দার আড়াল থেকে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তাঁদের সামনে আসেননি।

৯.২ নবী–পত্নী সাওদাহ বিনতু যামআর (রা) পর্দা

নবী-পত্নী সাওদাহর এক ভাই দাসী গর্ভজাত ছিলো। (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর সন্তান)। তার সম্পর্কে উতবাহ ইবনু আবী ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসকে (রা) বলে যান যে এই ছেলেটির দেখাশুনা করবে, সে আমার ঔরসজাত। বিষয়টি নবীর (সা) নিকট পেশ করা হলে তিনি সা'দের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "পুত্র তার যার শয্যায় সে জন্ম নিয়েছে। আর ব্যভিচারীর ভাগে পাথর।"

কিন্তু যেহেতু ছেলেটি সাওদাহর (রা) ভাই কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ ছিলো তাই নবী (সা) সাওদাহকে (রা) বললেন, "এই ছেলেটির সাথে পর্দা করবে।" সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ।

৯.৩ নবী–পত্নী উম্মু সালামাহ বিনতু আবী উমাইয়াহ এবং মাইমুনাহ বিনতু হারিসের (রা) পর্দা

একদিন নবী-পত্নী উম্মু সালামাহ (রা) এবং নবী-পত্নী মাইমুনাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বসা ছিলেন। সেই সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম সেখানে আসেন। নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে বললেন, "তোমরা উভয়ে এই ব্যক্তি থেকে পর্দা কর।" তাঁরা বললেন, "লোকটি তো অন্ধ। সে তো আমাদেরকে দেখতে ও চিনতে পারবেনা।" নবী (সা) বললেন, "তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবেনা?" উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, "এটি পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।" মুসনাদে আহমাদ, সুনানু আবী দাউদ, আল জামে' আত তিরমিযী।

৯.৪ নবী–পত্নী আয়িশাহ্ বিনতু আবী বাকরের (রা) পর্দা

আয়িশাহ (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়ম ছিলো, যখন তিনি দূরের সফরে বের হতেন 'কোরআ'র সাহায্যে ফায়সালা করতেন স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সংগী হবেন। বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের প্রাক্কালে 'কোরআ'-তে আমার নাম আসে। আমি তাঁর সাথে সফরে যাই। ফিরে আসার সময় মাদীনার কাছাকাছি এসে রাতে এক মানযিলে নবী (সা) তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষভাগে সেখান থেকে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়। আমি ঘুম থেকে ওঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় খেয়াল হলো যে আমার গলার হার কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে গেলাম। ইতোমধ্যে কাফিলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিলো যে রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের হাওদাযে ওঠে বসতাম, আর চারজন লোক এটাকে তুলে উটের ওপর বেঁধে দিতো। এই সময় খাদ্যের অভাবে আমরা মেয়েরা ছিলাম খুবই হালকা। আমার হাওদায তুলবার সময় লোকেরা অনুভবই করেনি যে আমি এর মধ্যে নেই। তারা হাওদায উটের ওপর বসিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো।

আমি হার খুঁজে পেয়ে তা নিয়ে ফিরে এসে সেখানে কাউকে পেলাম না। ফলে আমার চাদর দ্বারা সর্বাংগ ঢেকে সেখানেই বসে থাকলাম। ভাবলাম, সামনে গিয়ে লোকেরা যখন আমাকে পাবে না তখন আমার তালাশে ফিরে আসবে। এই অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল সুলামী আমি যেখানে ঘুমিয়ে ছিলাম সেখানে এসে পৌঁছেন। আমাকে দেখে তিনি চিনতে পারেন। কেননা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছেন। (এই সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন। সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিলো তাঁর অভ্যাস।) আমাকে দেখে তিনি উট থামান। বিস্ময়ের সাথে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, রাসূলের স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন।" এই শব্দগুলো কানে যেতেই আমার ঘুম ভেংগে যায়। আমি তাড়াতাড়ি ওঠে বসি এবং আমার চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে ফেলি। তিনি আমার সাথে কোন কথাই বললেন না। তিনি তাঁর উট বসিয়ে নিজে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের ওপর ওঠে বসলাম। তিনি লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলেন।......." সহীহ আল বুখারী

একবার আয়িশাহর (রা) নিকট আসে একজন অন্ধ লোক। তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। লোকেরা বললো, "আপনি এই লোক থেকে পর্দা করছেন, ওতো আপনাকে দেখতে পায় না।" আয়িশাহ (রা) বললেন, "কিন্তু আমি তো ওকে দেখতে পাই।"

আয়িশাহ (রা) বলেন, "বিদায় হাজ্জের সময় আমরা ইহরাম অবস্থায় মাক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিকরা যখন আমাদের নিকটবর্তী হতো আমরা মহিলারা মাথার ওপর থেকে চাদর টেনে চেহারা ঢেকে ফেলতাম। তারা চলে গেলে আমরা আবার চেহারা উন্মুক্ত করে নিতাম।" সুনানু আবী দাউদ

আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আয়িশাহর (রা) ভাই এই দুইজন আয়িশাহর ঘরে গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে নবীর (সা) গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন। এতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিলো। তিনি মাথায় পানি ঢেলে গোসল করলেন। এই সময় তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে পর্দা ঝুলানো ছিলো।" সহীহ আল বুখারী

আয়িশাহ (রা) বলেন,
আফলাহ আমার সামনে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম না। তিনি বললেন, "আপনি আমার থেকে পর্দা করছেন? আমিতো আপনার চাচা হই।" আমি বললাম, "আপনি কেমন করে আমার চাচা হন?" তিনি বললেন, "আমার ভাইয়ের স্ত্রী আপনাকে দুধ পান করিয়েছেন।" আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করলে তিনি বলেন, "আফলাহ সত্য বলেছে। তাকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দাও।" সহীহ আল বুখারী

৯.৫ নবীপত্নী সাফিয়া বিনতু হুয়াই-র পর্দা

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) খাইবার এবং মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাফিয়া বিনতু হুয়াই-র সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন। আমি মুসলিমদেরকে ওয়ালীমাহর দাওআত পৌঁছালাম। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গোশত-রুটি ছিলো না। নবী (সা) দস্তরখান বিছাতে বলেন। খেজুর, পনির এবং ঘি পরিবেশিত হয়। এটিই ছিলো রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়ালীমাহ। মুসলিমগণ বলাবলি করতে থাকে যে, তাকে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা দেয়া হবে, না দাসী করা হবে। কেউ কেউ বললো, 'নবী (সা) যদি তাঁকে হিজাবের মধ্যে রাখেন তাহলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত

হবেন, আর যদি হিজাবের মধ্যে না রাখেন তিনি দাসী বলে গণ্য হবেন।' কাফিলা রওয়ানা হবার সময় নবী (সা) তাঁর নিজের সওয়ারীর পেছনে জায়গা করেন এবং তাঁর ও লোকদের মধ্যে পর্দা টানিয়ে দেন।" সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম

খাইবার থেকে ফেরার পথে আল্লাহর রাসূল (সা) এবং সাফিয়া বিনতু হুয়াই একই উটের ওপর বসা ছিলেন। মাদীনার নিকটে এসে উটটি হোঁচট খায় এবং আরোহীদ্বয় মাটিতে পড়ে যান। আবু তালহা (রা) নিজের উট থেকে নেমে এসে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন! আপনি কি আঘাত পেয়েছেন?" আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "না, তবে মহিলার খবর লও।" আবু তালহা রুমাল দিয়ে চেহারা আড়াল করে সাফিয়ার নিকট যান এবং উটের ওপর তাঁর আসন ঠিক করে তাঁকে বসিয়ে দেন।" মুসনাদে আহমাদ

৯.৬ একজন নপুংসকের সাথে নবীপত্নীদের পর্দা

আয়িশাহ (রা) এবং উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূলের (সা) যুগে মাদীনায় ছিলো একজন নপুংসক ব্যক্তি। নবীপত্নী ও অন্যান্য মহিলাগণ তাকে 'খাহেশহীন, প্রয়োজনহীন, কৌতুহলহীন পুরুষ' মনে করে তাঁদের ঘরে আসা যাওয়া করতে দিতেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামাহর (রা) ঘরে অবস্থান করছিলেন। নপুংসক ব্যক্তিটি উম্মু সালামাহর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়াহর সাথে আলাপ করছিলো। আল্লাহর রাসূল (সা) তার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন। সে বলে, "তায়িফ দখল হলে গাইলান সাকাফীর মেয়ে বাদীয়াকে অবশ্যই হাসিল করতে হবে।" অতপর সে বাদীয়ার রূপ ও দেহ সৌষ্ঠবের বর্ণনা দিতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল (সা) এইসব কথা শুনে বলেন, "হে আল্লাহর দুশমন, তুই তো তাকে খুব লক্ষ্য করে দেখেছিস মনে হয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর পত্নীদেরকে তার সাথে পর্দা করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "এই লোক যেন ভবিষ্যতে আর ঘরে আসা-যাওয়া না করে।" পরে তিনি নপুংসক ব্যক্তিটিকে মাদীনা থেকে বের করে দেন। সাথে সাথে অন্য নপুংসক ব্যক্তিদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেন। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ

১০. মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে বাইরে যাওয়া নিষেধ

গৃহই মহিলাদের আসল কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করে বিভিন্নমুখী কাজ সম্পাদন করাই তাঁদের কর্তব্য। প্রয়োজনে তাঁদের বাইরে যাবার অনুমতি আছে। তবে তাবাররুজ নিষেধ করা হয়েছে।

'তাবাররুজ' শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে।

এক. কোন মহিলার নিজের চেহারা ও দেহশ্রী ভিন্ পুরুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করা। দুই. নিজের অলংকার ও পোষাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্য ভিন্ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা। তিন. চালচলন ও অংগভংগি দ্বারা নিজকে আকর্ষণীয় করে তোলা।

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহিলাদেরকে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। এমনকি যাতে লুকানো সৌন্দর্যের কথা ভিন্ পুরুষ জানতে পারে এমনভাবে মাটির ওপর পা মেরে চলাও তিনি নিষেধ করেছেন।

১০.১ বাইরে যেতে হলে চেহারা ঢেকে নেবার নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রী লোকদেরকে বল তারা যেন নিজেদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এটি অতীব উত্তম পন্থা, যাতে তাদেরকে চেনা যায় ও উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান।" সূরাহ আল আহ্যাব।। ৫৯

'ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবী বিহিন্না" আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে "তারা যেন নিজেদের জিলবাবের (বড়ো আকারের চাদর) একাংশ নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়।"

"ইদনা" শব্দের আসল অর্থ 'নিকটবর্তী করা' এবং 'পেঁচিয়ে নেয়া'। কিন্তু এরপর (على) শব্দ ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় "ইরখা" (ارخاء) মানে 'ওপর দিক থেকে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া।'

এই যুগের কোন কোন ব্যক্তি এই শব্দের অর্থ করেছেন শুধু 'পেঁচিয়ে নেয়া' যাতে চেহারা ঢাকার নির্দেশ প্রমাণিত না হয়।

কিন্তু আরবী ভাষায় পারদর্শী কোন ব্যক্তি এই শব্দের অর্থ শুধু 'পেঁচিয়ে নেয়া' গ্রহণ করতে পারেন না।

"মিন জালাবীবিহিন্না" শব্দগুলোও এই অর্থ গ্রহণের পথে বড়ো বাধা। এখানে যেই "মিন" শব্দটি রয়েছে তা কোন জিনিষের অংশবিশেষকে নির্দেশ করে। "মিন জালাবীবিহিন্না" অর্থ দাঁড়ায় 'চাদরের একাংশ।' অতএব "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না"-র অর্থ দাঁড়ায় 'তারা যেন চাদরটিকে ভালোভাবে পরে এর একাংশ নিজেদের ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়।'

আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকটবর্তী যুগের বড়ো বড়ো তাফসীরকারগণ এই আয়াতের এই অর্থই করেছেন।

ইবনু জারীর (তাবে তাবেয়ী) এবং ইবনুল মুনযির (তাবে তাবেয়ী) বর্ণনা করেন যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (জন্ম হিজরী ৩৩ সন, মৃত্যু হিজরী ১১০ সন) উবাইদাতুস্ সালমানীকে এই আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করেছিলেন। [উবাইদাতুস সালমানী রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর নিকট হাজির হতে পারেননি। উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি মাদীনায় আসেন।] মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের প্রশ্নের জবাবে তিনি মুখে কিছু না বলে নিজের গায়ের চাদর উঠিয়ে এমনভাবে পরলেন যে মাথা, কপাল এবং চেহারা ঢেকে গেলো, কেবল একটি চোখ খোলা রইলো।

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন এই আয়াতের। ইবনু জারীর (তাবে তাবেয়ী), ইবনু আবী হাতিম (তাবে তাবেয়ী) এবং ইবনু মারদুইয়া (তাবে তাবেয়ী) আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) যেইসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে রয়েছে, "আল্লাহ মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা কোন কাজে গৃহ থেকে বের হতে হলে নিজেদের চাদরের একাংশ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেদের চেহারা ঢেকে নেবে এবং শুধু চোখ খোলা রাখবে।"

আয়িশাহ (রা), আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) প্রমুখ মহিলাদের চেহারা ঢাকা অপরিহার্য গণ্য করেছেন।

প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ, সায়ীদ ইবনু মুসাইয়েব, ইব্রাহীম নখয়ী, হাসান আল বাসরী প্রমুখ মহিলাদের চেহারা প্রকাশযোগ্য মনে করেননি।

তাবেয়ীগণের পর যেই কয়জন বড়োবড়ো তাফসীরকার আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সকলে এই আয়াতের এই অর্থ করেছেন।

আবু জাফর ইবনু জারীর আত-তাবারী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ তাবে তাবেয়ী। তিনি ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতকের তাফসীরকার। তিনি হিজরী ২২৪ সনে জন্মগ্রহণ এবং হিজরী ৩১০ সনে ইন্তিকাল করেন।

সকলক্ষেত্রে তিনি দুইজন সেরা তাবেয়ী মুজাহিদ এবং দাহ্হাকের ওপর নির্ভর করেন যাঁরা প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরকার হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) পরই তাঁর স্থান। আল্লামা জালালুদ্দীন আস্সুয়ুতী (রহ) বলেন, "কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, এই তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে কোনটি আল কুরআনের মমার্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক, তাহলে আমি বলবো সেটি হলো ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর আত তাবারী রচিত তাফসীর আত্ তাবারী।" আল ইতকান

তাঁর তাফসীরকে "উম্মুত্ তাফাসীর" বা তাফসীরসমূহের জননী বা উৎস বলা হয়। ইবনু জারীর এই প্রখ্যাত তাফসীরে লিখেন, "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না" অর্থ ভদ্র মহিলাগণ যেন নিজেদের পোষাক দাসীদের মতো বানিয়ে গৃহ থেকে বের না হয় এবং তাদের চেহারা ও মাথার চুল যেন খোলা না থাকে। বরং তারা যেন তাদের চাদরের একাংশ ঝুলিয়ে রাখে যাতে কোন ফাসিক ব্যক্তি তাদের চেহারা দেখার হিম্মত না করে।" জামিউল বায়ান, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৩৩

হিজরী চতুর্থ শতকের প্রখ্যাত তাফসীরকার ছিলেন আল্লামা আবু বাকর আহমাদ ইবনু আলী আল জাস্সাস। তিনি হিজরী ৩৮০ সনে ইন্তিকাল করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন, "এই আয়াত প্রমাণ করে যে, যুবতীদেরকে তাদের চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় পূর্ণ আবরণ ও পবিত্র চরিত্রবতী হওয়ার প্রমাণসহ বেরুতে হবে যাতে সন্দেহযুক্ত চরিত্রের লোকেরা লালসাগ্রস্ত হতে না পারে।" আহকামুল কুরআন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৫৮

হিজরী পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের বড়ো মাপের তাফসীরকার ছিলেন আল্লামা জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনু উমার যামাখশারী। তিনি হিজরী ৪৬৭ সনে জন্মগ্রহণ এবং হিজরী ৫৩৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর তাফসীরে লিখেন, "ইউদদীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না" অর্থ হচ্ছে তারা তাদের চাদরের একাংশ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেবে এবং এর দ্বারা তাদের চেহারা ও আশপাশ ভালোভাবে আবৃত করে নেবে।" আল কাশশাফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২১

হিজরী ষষ্ঠ শতকের শ্রেষ্ঠ তাফসীরকার ফাখরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনুল হুসাইন আর-রাযী হিজরী ৫৪৩ সনে জন্মগ্রহণ এবং হিজরী ৬০৬ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর তাফসীরের নাম "মাফাতীহুল গায়ব"। এটিকে আত-তাফসীরুল কাবীরও বলা হয়। ইমাম আর-রাযী তাঁর তাফসীরে লিখেন, "এইরূপ নির্দেশ দ্বারা লোকদেরকে এই কথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে এরা চরিত্রহীনা মহিলা নয়। কেন না চেহারা সতরের মধ্যে শামিল না হওয়া সত্ত্বেও যেই মহিলা তার চেহারা ঢেকে রাখে সে অপর কোন ব্যক্তির কাছে আর কিছু খুলতে রাজি হবে এমন ধারণা কোন ব্যক্তিই করতে সাহস পাবে না। বরং তা দেখে সকলেই জানতে ও বুঝতে পারবে যে ইনি পর্দানশীল মহিলা, তাঁর সাথে কোনরূপ খারাপ কাজের আশা পোষণ করা যায় না।" তাফসীরে কাবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৯১

হিজরী সপ্তম-অষ্টম শতকের প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী হিজরী ৭২৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি লিখেন, "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না" অর্থ নিজের ওপর দিয়ে চাদরের একাংশ ঝুলিয়ে নেবে। এইভাবে মহিলাদের মাথা এবং চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" গারায়েবুল কুরআন, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৩২

হিজরী অষ্টম শতকের প্রখ্যাত তাফসীরকার ছিলেন নাসিরুদ্দীন আবুল খাইর আবদুল্লাহ ইবনু উমার আল বায়যাবী। তিনি হিজরী ৭৯১ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি লিখেন, "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না"-র অর্থ এই যে, যখন তারা আপন প্রয়োজনে বাইরে যাবে তখন চাদর দ্বারা শরীর ও চেহারা ঢেকে নেবে। এখানে 'মিন' শব্দটি 'তাব'য়ীদ'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের একাংশ দিয়ে মুখমণ্ডল' আবৃত করতে হবে এবং একাংশ শরীরের ওপর জড়িয়ে দিতে হবে।" তাফসীরে বায়যাবী

১০.২ চেহারা খোলা রাখার পক্ষে একটি খোঁড়া যুক্তি

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল ফাদল ইবনুল আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে সওয়ারীর ওপর বসা ছিলেন। বানু খাসআম-এর একজন মহিলা নিকটে এলো। আল ফাদল মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মহিলাটিও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। নবী (সা) আল ফাদলের চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলাটি বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর ফারয হাজ্জ আমার অতি বৃদ্ধ আব্বার ওপর বর্তেছে। অথচ তিনি সওয়ারীর ওপর বসে থাকতে অক্ষম। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করতে পারি?" নবী (সা) বললেন, 'হাঁ।' এটি ছিলো বিদায় হাজ্জের একটি ঘটনা। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ আল আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। "বিদায় হাজ্জকালে নবীর (সা) চাচাতো ভাই আল ফাদল ইবনুল আব্বাস, যিনি তখন যুবক বয়সের ছিলেন, মাশআরিল হারাম থেকে ফিরে আসার সময় নবীর (সা) সাথে একই উটে সওয়ার ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি পথচলারত মহিলাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নবী (সা) তাঁর চেহারার ওপর হাত রাখলেন এবং তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।" সুনানু আবী দাউদ

এই ঘটনা দুইটিকে কেন্দ্র করে একদল লোক অদ্ভুত যুক্তি দাঁড় করাতে সচেষ্ট। তাঁরা বলতে চান যে মহিলাদের চেহারা ঢাকা যদি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্যই হতো তাহলে পথচলারত মহিলাগণ তো নিকাব পরিহিত অবস্থায় থাকার কথা ছিলো।

তাঁরা আরো বলেন যে আল্লাহর রাসূল (সা) উভয় ক্ষেত্রেই আল ফাদল ইবনুল আব্বাসের চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তিনি মহিলাদেরকে চেহারা ঢেকে নিতে বলেননি, মহিলাদের জন্য চেহারা ঢাকা অপরিহার্য হলে তিনি অবশ্যই সেই নির্দেশ দিতেন। কিন্তু এই ভায়েরা এই কথা বেমালুম ভুলে যান যে ইসলামী শারীয়াহ হাজ্জে মহিলাদেরকে চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছে। মহিলাগণ শারীয়াহর সীমালংঘন করেননি। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে শুধরাবার চেষ্টা করেননি।

১০.৩ সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদের বাইরে আসা নিষেধ

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহর দাসীদেরকে (মহিলাদেরকে) মাসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে না আসে।" সুনানু আবী দাউদ, মুসনাদে আহমাদ

একদিন একজন মহিলা মাসজিদ থেকে বের হয়ে পথ চলছিলো। আবু হুরাইরাহ (রা) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে। তিনি বললেন, 'হে মহা শক্তিমান আল্লাহর দাসী, তুমি কি মাসজিদ থেকে আসছো?' সে বললো, 'হাঁ'। তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রিয় নবী আবুল কাসিমকে বলতে শুনেছি, "যেই মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে মাসজিদে আসবে সেই মহিলা ঘরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসল না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হয় না।" সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ, সুনানু নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ

আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, "যেই মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদেরকে মাতিয়ে তোলার জন্য পথেঘাটে চলে সেতো এমন এমন (খুব শক্ত কথা বললেন)।" আল জামে' আত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যেই মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে ঘরের বাইরে লোকদের কাছে যাবে এই উদ্দেশ্যে যে লোকেরা সেই সুগন্ধি শুকবে, সেই মহিলা যিনাকারিণী গণ্য হবে।" মুসনাদে আহমাদ

১০.৪ বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের কণ্ঠস্বর ভিন্ পুরুষকে শুনানো নিষেধ

প্রয়োজনে মহিলাদেরকে ভিন্ পুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পত্নীগণ তাঁদের কথার মাধ্যমে লোকদেরকে দীনের জ্ঞান দান করেছেন।

কিন্তু যেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই, দীনী ফায়দাও নেই সেই ক্ষেত্রে ভিন্ পুরুষকে মহিলাদের কণ্ঠস্বর শুনানো শারীয়াহ সমর্থন করেনা।

মহিলাদের কণ্ঠস্বর ভিন্ পুরুষের কানে যাওয়াকে পছন্দ করা হয়নি বলেই ইসলাম মহিলাদেরকে আযান দেয়ার কাজে লাগায়নি। একই কারণে জামাআতে সালাত আদায় করাকালে ইমাম ভুল করলে একজন পুরুষকে 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দিতে বলা হয়েছে এবং একজন মহিলাকে লোকমা দিতে বলা হয়েছে মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ না করে হাতের ওপর হাত মেরে শব্দ সৃষ্টি করে। আল হাদীসে এটাকেই বলা হয়েছে "আত্ তাসবীহু লির্ রিজালে ওয়াত্ তাসফীকু লিন্ নিসায়ে"। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে

আহমাদ, আল জামে' আত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী, সুনানু ইবনু মাজাহ

প্রয়োজনে একজন ভিন্ পুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলতে দোষ নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কথা বলার ভংগি কেমন হবে তাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বাতলে দিয়েছেন। বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কথা সোজা ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০.৫ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজাত করে। ....."

সূরাহ আন্ নূর।। ৩০

"মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজাত করে। ....."

সূরাহ আন্ নূর।। ৩১

আপন স্ত্রী কিংবা মুহাররাম মহিলা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে চোখ ভরে দেখা কোন পুরুষের জন্য হালাল নয়।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "মানুষ তার অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা যিনা করে থাকে। চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, জিহবার যিনা হচ্ছে রসালাপ করা, কানের যিনা হচ্ছে কণ্ঠস্বর শুনে স্বাদ গ্রহণ করা, হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা (বা ধরা), পায়ের যিনা হচ্ছে অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা। যিনার এইসব প্রাথমিক কাজ হয়ে যাওয়ার পর লজ্জাস্থান হয় তা কার্যত পূর্ণ করে অথবা তা অপূর্ণ থেকে যায়।" সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ

ভিন্ মহিলার ওপর দৃষ্টি পড়লে সংগে সংগে চোখ ফিরিয়ে নিতে বলেছেন আল্লাহর রাসূল (সা)। বুরাইদাহ বর্ণনা করেন, নবী (সা) আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) বলেন, "একবার দৃষ্টি পড়ার পর আরেকবার তাকাবে না। প্রথম দৃষ্টি মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দৃষ্টি মাফ হবে না।" মুসনাদে আহমাদ, আল জামে' আত-তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, দারেমী

জারীর ইবনু আবদিল্লাহ আল বাজালী (রা) বলেন, আমি (কোন মহিলার ওপর) হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়া সম্পর্কে নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

"সংগে সংগে চোখ ফিরিয়ে নাও।" সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, "দৃষ্টিতো ইবলীসের অন্যতম বিষাক্ত তীর। যেই ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এই দৃষ্টি ত্যাগ করবে আমি তাকে ঈমান দেবো যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।" তাবারানী

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী (সা) বলেছেন, "কোন মুসলিমের দৃষ্টি যদি কোন মহিলার সৌন্দর্যের ওপর পড়ে যদি সে তার চোখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তার ইবাদাতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেন।" মুসনাদে আহমাদ

দৃষ্টি সংযত রাখা সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতাংশ সম্পর্কে কেউ কেউ বলতে চান যে আল্লাহর রাসূলের (সা) যামানায় মুমিন মহিলাগণ নিশ্চয়ই চেহারা খোলা রাখতেন, তা না হলে পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন।

আয়াতের প্রথমাংশের যদি এইরূপ মর্মার্থ নেয়া হয়, তাহলে তো দ্বিতীয়াংশের মর্মার্থ নিতে হয় যে আল্লাহর রাসূলের (সা) যামানায় মুমিনগণ নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজাত করতেন না, তা না হলে তাঁদেরকে লজ্জাস্থানের হিফাজাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন। নাউজুবিল্লাহ, আয়াতাংশের এইরূপ মমার্থ গ্রহণ করার অর্থ হবে আসহাবে রাসূল সম্পর্কে নিকৃষ্টতম ধারণা পোষণ করা। অথচ তাঁরাই হচ্ছেন মানব জেনারেশনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জেনারেশন।

বরং দুইটি আয়াতাংশ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার যে চোখাচোখি থেকে যৌন অপবিত্রতা সৃষ্টির যেই আশংকা রয়েছে সেই দিকে জ্ঞানময় আল্লাহ ইংগিত করেছেন কিনা এবং সেই ব্যাপারে সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাকে সতর্ক থাকার জন্য আহবান জানিয়েছেন কিনা।

১০.৬ দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য

দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মহিলাদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে অতোটা কড়াকড়ি নেই যতোটা কড়াকড়ি আছে পুরুষদের পক্ষে মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে।

পথ চলাকালে কিংবা দূর থেকে কোন বৈধ খেলা দেখাকালে পুরুষদের ওপর মহিলাদের দৃষ্টি পড়া নিষেধ নয়।

আয়িশাহর (রা) বর্ণনাতেই আমরা পাই যে, 'হিজরী সপ্তম সনে হাবশা থেকে একটি প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসে। মাসজিদে নববী এলাকায় সেই দল একটি বিশেষ খেলার আয়োজন করে। নবী (সা) নিজে আয়িশাহকে (রা) সেই খেলা দেখান। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ

ইমাম হাজার আল আসকালানী বলেন, "এটি যে জায়েয তার সমর্থন এ থেকে পাওয়া যায় যে মহিলাদের বাইরে যাওয়া জায়েয রূপেই সমর্থিত হয়েছে। মাসজিদে, বাজারে ও সফরে মহিলাগণ চেহারায় নিকাব রেখেই যাতায়াত করে। উদ্দেশ্য এই যে পুরুষগণ যাতে তাদেরকে দেখতে না পায়। কিন্তু মহিলাদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পুরুষদেরকে চেহারায় নিকাব দিয়ে বাইরে যেতে বলা হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই দুইটি ব্যাপারে শারীয়াহর বিধান একরূপ নয়, বরং ভিন্ন রূপ।" নাইলুল আওতার, ইমাম শাওকানী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০১

কিন্তু তাই বলে মহিলাগণ সাগ্রহে ভিন্ পুরুষদের দেখবেন এবং তাঁদের চোখের ক্ষুধা মেটাবেন তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

১১. পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ

১১.১ পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ সাক্ষাত নিষেধ

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা (গায়রে মুহাররাম) মহিলাদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক।" সহীহ্ আল বুখারী

আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, "নবী (সা) স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।" তাবারানী

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যেই পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার শয্যায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন।" মুসনাদে আহমাদ

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোন মুহাররাম সংগী ছাড়া কোন মহিলা সফর করবেনা এবং কোন মুহাররামকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে যাবে না।" সহীহ্ আল বুখারী

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যেইসব মহিলার স্বামী অনুপস্থিত তাদের নিকট যাবে না। কেননা শাইতান তোমাদের মাঝে রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।" আল জামে' আত্ তিরমিযী

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন মহিলার নিকট বসবে না যদি সেই মহিলার কোন মুহাররাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শাইতান।" আহমাদ

তামীম ইবনু আবী সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রা) কোন প্রয়োজনে আলী ইবনু আবী তালিবের (রা) বাড়িতে যান। তিনি আলীকে পেলেন না। তিনি ফিরে গিয়ে আবার এলেন। এবারও আলীকে পেলেন না। ফিরে গিয়ে তৃতীয়বার এসে তিনি আলীকে পেলেন। আলী (রা) বললেন, "আপনার প্রয়োজন যখন ফাতিমার সাথে সম্পর্কিত ছিলো আপনি ফিরে না গিয়ে তার কাছে গেলেন না কেন?" জবাবে তিনি বললেন, "মহিলাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" সহীহ্ আল বুখারী

এইসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণত কোন পুরুষের পক্ষে কোন গায়রে মুহাররাম মহিলার নিকট যাওয়া নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে কোন পুরুষ কোন গায়রে মুহাররাম মহিলার নিকট যেতে হলে তার স্বামী অথবা মুহাররাম কোন পুরুষের উপস্থিতিতে যেতে হবে।

১১.২ মহিলাদের দীনী তালিমের পৃথক ব্যবস্থা

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, পুরুষরা তো আপনার সমস্ত বাণী নিয়ে গেছে। আমাদের জন্য আপনি দিন নির্দিষ্ট করুন। সেদিন আমরা আপনার নিকট আসবো। আপনি আমাদেরকে দীন শেখাবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্রিত হবে।" তারা একত্রিত হলো। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের কাছে গেলেন। আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা তাদেরকে শেখালেন।" সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম

এক আনসারীর বাড়িতে সমবেত মহিলাদেরকে দীনী তালিম দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) পাঠান। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

সাধারণভাবে সাহাবীদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ ছিলো, "তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনের নিকট যাও, তাদের মাঝে বসবাস কর, তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে তাদেরকে নির্দেশ দাও।" সহীহ আল বুখারী

১১.৩ মাসজিদে মহিলাদের পৃথক অবস্থান

আল্লাহর রাসূল (সা) মাসজিদে নববীতে সালাতের জামাআতে অংশগ্রহণে আগ্রহী মহিলাদের জন্য একটি প্রবেশ পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। মহিলাগণ সেই পথে আসা-যাওয়া করতেন। পুরুষগণ সেই পথে আসা-যাওয়া করতেন না।

আল্লাহর রাসূল (সা) মহিলাদেরকে পুরুষদের কাতারগুলোর শেষে আলাদা কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন।

উম্মু সালামাহ (রা) বর্ণনা করেন যে সালাতের জামাআত শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন।

১১.৪ ঈদের ময়দানে মহিলাদের পৃথক অবস্থান

ঈদের ময়দানে মহিলাগণ পুরুষদের থেকে আলাদা স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতেন। পুরুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের নিকট গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন।

ইমাম নববী (রহ) বলেন, "মহিলাগণ যখন পুরুষদের সাথে সালাতে কিংবা সমাবেশে উপস্থিত হতেন তাঁরা পুরুষদের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করতেন। তা করা হতো নৈতিক বিপদ, চোখাচোখি কিংবা খারাপ চিন্তা উদ্ভব হওয়ার আশংকা থেকে বাঁচার জন্য।"

১১.৫ পথ চলার সময় একাকার না হয়ে যাওয়ার নির্দেশ

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মাসজিদে নববীর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে পান যে রাস্তায় পুরুষ ও মহিলাগণ একাকার হয়ে গেছে। তিনি মহিলাদেরকে ডেকে বললেন, 'মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের উচিত নয়। রাস্তার পাশ ধরে চল।' এই নির্দেশ শুনার সাথে সাথে মহিলাগণ রাস্তার পাশ ধরে চলতে শুরু করেন। সুনানু আবী দাউদ

১১.৬ ভিন্ পুরুষ ও মহিলাকে স্পর্শ করা নিষেধ

আয়িশাহ (রা) বলেন, "নবীর (সা) হাত কখনো পরনারীর দেহ স্পর্শ করেনি। তিনি মহিলাদের নিকট থেকে মৌখিকভাবে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। আর তারা যখন প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্পন্ন করতো তিনি বলতেন, "যাও, তোমাদের বাইয়াত হয়ে গেছে।" সুনানু আবী দাউদ

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "... হাতের যিনা হচ্ছে ভিন্ মহিলাকে হাত দিয়ে ধরা।..." সহীহ মুসলিম

আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুসৃত নীতি এবং তাঁর বাণীর আলোকে আসহাবে রাসূল তাঁদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। পুরুষ সাহাবীগণ ভিন্ মহিলাকে এবং মহিলা সাহাবীগণ ভিন্ পুরুষকে স্পর্শ করা সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করা কালেও মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের এই সতর্কতা পরিত্যাগ করেননি।

১২. ঈদের ময়দানে মহিলাদের উপস্থিতি

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ঈদে সালাতের জন্য বের হতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে বের করে নিতেন।' মুসনাদে আহমাদ

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ঈদের (সালাতের) জন্য বের হতেন এবং তাঁর কন্যা ও স্ত্রীগণকেও বের হতে নির্দেশ দিতেন।' মুসনাদে আহমাদ

আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, 'মহিলারা কি ঈদের (সালাতের) জন্য বের হবে?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। জিজ্ঞেস করা হলো, 'যুবতী মেয়েরাও কি বের হবে?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। নিজের কাপড় না থাকলে কোন সখীর কাপড় পরে বের হবে'? তাবারানী

উম্মু আতীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আদহার দিনে যুবতী অন্তঃপুরবাসিনী ও হায়েজ সম্পন্না মহিলাদেরকে বের করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।' মুসনাদে আহমাদ

ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আদহা মুসলিম উম্মাহর দুইটি জাতীয় উৎসব। ঈদুল ফিতরের দিন এক একটি এলাকার মুসলিমগণ বড়ো ময়দানে একত্রিত হয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করেন এবং ইমামের ভাষণ শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। অতপর তাঁরা প্রাণ খুলে আলাপ করেন একে অপরের সাথে। সম্ভব মতো তাঁরা একে অপরের বাড়িতে গিয়ে সৌহার্দ প্রকাশ করেন।

ঈদুল আদহার দিনে মুসলিমগণ অনুরূপভাবে ময়দানে সমবেত হয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় এবং ইমামের ভাষণ শুনার পর একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতপর তাঁরা যার যার সুবিধা মতো স্থানে তাঁদের কুরবানীর পশু জবাই করেন মহান আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের জন্য। আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করতে পারার আনন্দে ভরে ওঠে তাঁদের মন।

ঈদের এই আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) মহিলাদেরকেও ঈদের ময়দানে যেতে উৎসাহিত করেছেন।

আল্লামা শাওকানী বলেন, "দুই ঈদের সালাতের জন্য কোন মহিলার ময়দানে বের হওয়া শারীয়াহ সম্মত কাজ। এতে কুমারী আর অকুমারী, যুবতী আর বৃদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদি সে ইদ্দত পালনরত না হয় কিংবা তার বের হয়ে আসার কারণে কোন বিপদ না হয় কিংবা তার নিজের কোন ওযর থাকে।" নাইলুল আওতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা

তবে ঈদের সালাত পুরুষদের জন্যে ওয়াজিব। কিন্তু মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়।

১৩. যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের উপস্থিতি

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সাথে উম্মু সুলাইম (রা) এবং আনসারদের কয়েকজন মহিলা সংগে যেতেন। তাঁরা যোদ্ধাদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করতেন।" সহীহ মুসলিম

রুবাই বিনতু মু'আওবিয (রা) থেকে বর্ণিত।

'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাতাম। তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম। নিহত ও আহতদেরকে মাদীনায় পাঠাতাম।' সহীহ আল বুখারী

হাফসা বিনতু সীরীন থেকে বর্ণিত। .... একজন ভদ্র মহিলা এলেন। তিনি বলেন যে, তাঁর বোনের স্বামী নবীর (সা) সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। তাঁর বোনও স্বামীর সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ আমরা রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ঔষধ লাগিয়ে দিতাম।' সহীহ আল বুখারী

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত।

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মু সুলাইম (রা) একটি খনজর সংগে নিয়েছিলেন। (তাঁর স্বামী) আবু তালহা (রা) সেটি দেখে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, উম্মু সুলাইমের কাছে একটি খনজর আছে।' রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই খনজর কি কাজে লাগবে?' উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, 'এটা আমি এই জন্য এনেছি যে যদি মুশরিকদের কেউ আমার কাছাকাছি এসে যায় আমি এটা দিয়ে তার পেট ফেড়ে ফেলবো।' এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) হেসে দেন। সহীহ মুসলিম

সহীহ মুসলিম-এর শরাহতে ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন, "মহিলাদের এই সেবা-শুশ্রূষা ছিলো তাঁদের মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁদের স্বামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য যা কিছু করা হতো তাতে সাধারণত দেহ স্পর্শ করা হতো না। একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে নির্দিষ্ট স্থানটুকু স্পর্শ করা স্বতন্ত্র কথা।"

আল্লাহর রাসূলের (সা) যামানায় কিছু সংখ্যক মহিলা আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুমতি নিয়ে বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য কোন কোন যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন। তাঁরা আলাদাভাবে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন।

হাজার হাজার মহিলা সাহাবীর মধ্যে মাত্র কয়েক জনই যুদ্ধের ময়দানে যেতেন। তাঁরা তাঁদের স্বামী কিংবা পিতা কিংবা ভাইয়ের সাথে যেতেন। একটি অভিযানে নবী-পত্নীদের মাত্র একজনই তাঁর সাথে যেতেন। অন্যরা গৃহেই অবস্থান করতেন।

ইবনু সা'দ তাবাকাতুল কুবরাতে লিখেছেন যে খাইবার যুদ্ধের ময়দানে সর্বমোট পনরজন মহিলা গিয়েছিলেন। আবার দেখা যায়, বদর যুদ্ধের ময়দানে কোন মহিলা সাহাবী উপস্থিত ছিলেন না। তেমনিভাবে তাবুক অভিযানে কোন মহিলা সাহাবী অংশ নেননি।

তাবুক বাহিনী ছিলো আল্লাহর রাসূলের (সা) পরিচালিত সর্ববৃহৎ বাহিনী। ত্রিশ হাজার মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেন এই অভিযানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার তাকিদ দিয়ে বলেন,

"ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কি হয়েছে যে যখন তোমাদেরকে বলা হয় 'আল্লাহর পথে বের হও', তোমরা যমীনকে আঁকড়ে থাক? তোমরা কি আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবনের ওপর সন্তুষ্ট? অথচ দুনিয়ার সামগ্রী আখিরাতে খুবই সামান্য। তোমরা যদি বের না হও তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কাউমকে আনবেন, আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান। তোমরা যদি তাকে (নবীকে) সাহায্য না কর আল্লাহ তো ইতোপূর্বেও তাকে সাহায্য করেছেন যখন তাকে কাফিরগণ বের করে দিয়েছিলো এবং গুহাতে দুই জনের দ্বিতীয় জন তার সাথীকে বলেছিলো, 'চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অতপর আল্লাহ তার প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে এমন বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেন যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হতো না এবং তিনি কাফিরদের কথাকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো উঁচু থাকেই। আল্লাহ প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়। হালকা কিংবা ভারী যেই কোন অবস্থাতেই থাকো না কেন বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি বুঝ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।" সূরাহ আত্ তাওবাহ।। ৪০, ৪১

এই অভিযানে বের না হলে আল্লাহ নবীর (সা) সাথীদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁদেরকে হটিয়ে অন্য কোন জনগোষ্ঠীকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন; অনুকূল কিংবা প্রতিকূল যেই কোন অবস্থাতেই তাঁরা থাকুন না কেন তাঁদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) জানতেন এই নির্দেশ পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। তাই তিনি সকল সক্ষম পুরুষকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে বলেন। কিন্তু একজন মহিলাকেও বের হতে বলেন নি।

উল্লেখ্য যে কা'ব ইবনু মালিক (রা), হিলাল ইবনু উমাইয়া (রা) এবং মুরারাহ ইবনু রুবাই (রা) গাফলত বশতঃ তাবুক অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। তাবুক থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে বয়কট করেন।

পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সা) এবং সাহাবাগণ তাঁদের সাথে কোন কথা বলেন নি। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করার পর আল্লাহর রাসূল (সা) এবং সাহাবীগণ তাঁদের সাথে কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু কোন মহিলা সাহাবীর বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কারণ যুদ্ধে যোগদানের বাধ্যবাধকতা ইসলাম মহিলাদের ওপর চাপায়নি।

উল্লেখ্য যে যুদ্ধ একটি জরুরী পরিস্থিতি। যুদ্ধ একটি জাতির জন্য জীবন-মরণ সমস্যা সৃষ্টি করে। এই জরুরী অবস্থায় মহিলাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে যে জরুরী পরিস্থিতি একটি বিশেষ পরিস্থিতি, একটি অসাধারণ পরিস্থিতি। বিশেষ পরিস্থিতিতে ঠেকায় পড়ে মানুষ যা করতে বাধ্য হয় সাধারণ পরিস্থিতিতে তা করা যুক্তি সংগত নয়।

১৪. পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত ফোরামের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পুরুষদের

আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "পুরুষগণ মহিলাদের কাউয়াম এই কারণে যে আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এই জন্যও যে পুরুষ তাদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে।" সূরাহ আন্ নিসা ।। ৩৪

'কাউয়াম' তাঁকেই বলা হয় যিনি কোন ব্যক্তি, সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবেই এই ধরনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। এই বিশিষ্টতার কারণেই পরিবার সংগঠনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র-সংগঠনের বৃহৎ পরিসর পর্যন্ত নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পুরুষদের ওপরই অর্পিত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মহিলাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়নি। মহিলা সাহাবীগণও কখনো নেতৃত্ব দাবি করেননি।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মহিলা সাহাবীগণ মাসজিদে গিয়ে সালাতের জামাআতে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ঈদের ময়দানে যেতে চাইতেন। যুদ্ধের ময়দানে যাবার আগ্রহও তাঁরা ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু কোন মহিলা সাহাবী কখনো এই দাবি করেননি যে আমাদেরকে সালাতের জামাআতের ইমাম বানানো হোক, আমাদেরকে কোন কোন প্রদেশে গভর্নর নিযুক্ত করা হোক, আমাদেরকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক কিংবা আমাদেরকে মাজলিসে শূরার সদস্য বানানো হোক।

আল্লাহর রাসূলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিলো, "তাদের সাথে সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ কর।" এই নির্দেশের আলোকে তিনি বিভিন্ন সময় সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করার জন্য বসতেন। অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। কিন্তু এইসব পরামর্শ সভায় কোন মহিলাকে

তিনি শামিল করেননি কখনো। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন কোন মহিলা সাহাবীর পরামর্শ শুনেছেন। কিন্তু পুরুষদের সাথে সামষ্টিক ফোরামে এসে বক্তব্য রাখতে বলেননি তাঁদেরকে।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর একই ধারা অব্যাহত থাকে। সাকীফা বানু সায়েদাতে আনসারগণ সমবেত হয়েছিলেন আমীর নির্বাচনের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে। সেখানেও কোন মহিলা সাহাবী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ নেই। আমীরুল মুমিনীন আবু বাকর আস সিদ্দিক (রা) বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। কিন্তু এতে মহিলা সাহাবীদের শামিল করার কোন নজীর নেই। আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মাজলিসে শূরা নাম দিয়েই পরামর্শ সভা গঠন করেন। উসমান ইবনু আফফান (রা), আলী ইবনু আবী তালিব (রা), আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা), মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), উবাই ইবনু কাব (রা), যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) প্রমুখ সেই মাজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। কিন্তু এতেও কোন মহিলা সাহাবী শামিল ছিলেন না। অপর দুইজন খালীফায়ে রাশেদ উসমান ইবনু আফফান (রা) এবং আলী ইবনু আবী তালিবও (রা) পরামর্শ সভাতে মহিলা সাহাবীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

প্রকৃতপক্ষে আমীরুল মুমিনীন এবং মাজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠনের কাউয়াম। আর কাউয়াম পদ যে পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট এই বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা ছিলোনা পুরুষ কিংবা মহিলা সাহাবীদের মনে।

এই প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীসটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আবু বাকরাহ (রা) বর্ণনা করেন, "ইরানীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর সম্রাট-কন্যাকে সিংহাসনে বসায়। এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যেই জাতি কোন মহিলার ওপর তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব অর্পণ করে সেই জাতি কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারেনা।" সহীহ্ আল বুখারী

উল্লেখ্য যে পুরুষ ও মহিলাদের সম্মিলিত কোন সংস্থা, ফোরাম কিংবা সংগঠনের নেতৃত্ব পদে একজন মহিলা সমাসীন হতে পারেন না, কিন্তু কোন মহিলা সংস্থা, ফোরাম কিংবা সংগঠনের নেতৃত্বে একজন মহিলা অবশ্যই সমাসীন হতে পারেন। এমনকি মহিলাগণ স্বতন্ত্রভাবে সালাতের জামাআত কায়েম করলে সেখানে একজন মহিলা জামাআতের ইমাম হতে পারেন।

আবার, মহিলাদের কেউ কেউ মহিলাকুলের প্রতিনিধি হিসেবে দল প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে পারেন। মহিলা সাহাবী আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা) এই ভূমিকাই পালন করেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে।

অন্যান্য বিষয়ের মতো 'কাউয়াম' প্রশ্নেও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহর অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ।

আল ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে ওঠে দাঁড়ালেন এবং এক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখলেন। এতে আমাদের অন্তর শিউরে ওঠলো, চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনিতো মনে হয় বিদায়ের ভাষণ দিলেন। সুতরাং আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং একজন হাবশী গোলামও যদি শাসক হয় তার কথা শুনা ও মানা তোমাদের কর্তব্য। আমার পরে তোমরা অচিরেই কঠিন কঠিন মতভেদ দেখতে পাবে। সেই সময় আমার সুন্নাহ এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা তোমাদের ওপর ওয়াজিব। (দীনের ব্যাপারে) অভিনব বিষয়গুলো পরিহার করে চলা তোমাদের কর্তব্য। কেননা প্রতিটি অভিনব বিষয়ই (বিদ'আত) গুমরাহী।" সুনানু ইবনু মাজাহ, সুনানু আবী দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, আল জামে আত তিরমিযী

মহিলাদেরকে পুরুষ ও মহিলাদের যৌথ ফোরামের নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ না দেয়াটাকে কেউ কেউ তাঁদের জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করে থাকেন। আসলে এটা তাঁদের জন্যে মোটেই মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা নয়। তাঁদের সৃষ্টিগত শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখেই মহান স্রষ্টা তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মানব রচিত ব্যবস্থার দিকে একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখুন না। এখানেও দেখতে পাবেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে অবাধে সকল ক্ষেত্রে পদচারণা করতে দেয়া হয় না।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিচারপতিদেরকে রাজনৈতিক দল গঠন, পার্লামেন্টের সদস্যপদ গ্রহণ কিংবা সরকার গঠন করতে দেয়া হয় না। এই ব্যবস্থা কি তাঁদের জন্য মর্যাদাহানিকর? মোটেই না। বিচারপতিগণ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লে তাঁদের ওপর ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিরপেক্ষ বিচারকার্য পরিচালনার যেই মহান কর্তব্য অর্পিত তা বিঘ্নিত হবে বলেই এই ব্যবস্থা।

সেনাবাহিনীর লোকদেরকে রাজনৈতিক দলগঠন, পার্লামেন্টের সদস্যপদ গ্রহণ কিংবা সরকার গঠন করতে দেয়া হয় না। এই ব্যবস্থা কি তাঁদের জন্য মর্যাদাহানিকর? মোটেই না। তাঁদের ওপর রয়েছে দেশের ভৌগোলিক সীমানা রক্ষার গুরু দায়িত্ব। একনিষ্ঠভাবে দেশরক্ষার মহান কর্তব্য পালনের সুযোগ দেয়ার জন্যই তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা হয়।

প্রশাসন যন্ত্রে সমাসীন ব্যক্তিদেরকেও রাজনৈতিক দলগঠন, পার্লামেন্টের সদস্যপদ গ্রহণ কিংবা সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয় না। এটা কি তাঁদের জন্য মর্যাদাহানিকর? মোটেই না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির ডামাডোলে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে দেশের জনগণ তাঁদের কাছ থেকে যেই খিদমাত আশা করে তা পাওয়া সম্ভব নয় বলেই আইন করে তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হয়।

মহিলাদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন। এই কর্তব্যগুলোর সঠিক প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে মানব বংশের সংরক্ষণ এবং সভ্যতার সুস্থ বিকাশ। পুরুষ ও মহিলাদের যৌথ ফোরাম পরিচালনা, রাজনৈতিক দল গঠন, পার্লামেন্টের সদস্যপদ গ্রহণ কিংবা সরকার গঠন এমনসব জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ কাজ যা করতে গেলে সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের কারণেই মহিলাদের বারবার হোঁচট খাওয়ার কথা। আর এইসব কাজে জড়িয়ে পড়লে তাঁদের ওপর স্বাভাবিকভাবে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস রাখা উচিত যে জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যেই কর্মবিভাজন করেছেন এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ।

১৫. বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাক্ষাত

ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক অংগন গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় নয়।

কিন্তু ইসলাম কোন অবাস্তব ও অযৌক্তিক জীবন বিধান নয়। বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের জন্য ইসলামের ব্যতিক্রম নীতি বর্তমান। তাই বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে কিংবা কোন মহিলা কোন পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন।

এটি হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। ব্যতিক্রমকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করা সঠিক কাজ নয়। যদি তা করা হয় তাহলে কালক্রমে ইসলামের মূলধারা হারিয়ে যেতে বাধ্য।

মহানবী (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন ব্যক্তি এইগুলোকে ভিত্তি করে বলতে চান যে ইসলাম আসলে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশার বিরোধী নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মূলধারার সাথে এই চিন্তা সাংঘর্ষিক। এটি একটি একপেশে চিন্তা। আসুন, আমরা ইসলামের সোনালী যুগের ব্যতিক্রম কয়েকটি ঘটনার বিশেষ প্রেক্ষাপট অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

১৫.১ আল্লাহর রাসূল (সা) উম্মু সুলাইম আল গুমাইসাহর (রা) বাড়িতে বারবার যেতেন কেন

উম্মু সুলাইম আল গুমাইসাহ বিনতু মিলহান ইবনু খালিদ (রা) বানু নাজ্জারের এক অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আম্মা আমিনাহ ও উম্মু সুলাইমের বোন উম্মু হারাম শিশুকালে একই মহিলার বুকের দুখ পান করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমাহ বিনতু আমরের বংশ আমির ইবনু গানামে গিয়ে উম্মু সুলাইমের মায়ের বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। উসুদুল গাবা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৭

মুহাম্মাদ (সা) হিজরাত করে মাদীনায় এলে উম্মু সুলাইম তাঁর দশ বছরের ছেলে আনাসের হাত ধরে আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, "ইয়া

রাসূলাল্লাহ, এই থাকলো আনাস, সে আপনার খিদমাত করবে।"

আল্লাহর রাসূল (সা) যেই মিটিংয়ে বসে মাক্কা থেকে আগত মুহাজির এবং মাদীনার আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন সেই মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো উম্মু সুলাইমের বাড়িতে।

উম্মু সুলাইম মাঝেমধ্যে খাবার তৈরি করে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য পাঠাতেন। ঘরে ভালো কিছু তৈরি হলে তার কিছুটা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকটি বিয়েতে কনেকে সাজাবার কাজ তিনিই করেছেন।

উম্মু সুলাইমের আব্বা মিলহান ইবনু খালিদ (রা) বদর যুদ্ধে শহীদ হন।

উম্মু সুলাইমের ভাই হারাম ইবনু মিলহান বীরে মাউ'নায় শাহাদাত লাভ করেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের ঘর ছাড়া একমাত্র উম্মু সুলাইমের ঘরে যেইভাবে গেছেন সেইভাবে আর কোথাও যাননি। একবার রাসূলুল্লাহকে (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "তার জন্য আমার দয়া হয়। তার আব্বা ও ভাই আমার সাথে থেকে শহীদ হয়েছে।" সহীহ মুসলিম

১৫.২ আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) উম্মু আইমনের (রা) সাথে দেখা করতে যান কেন

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর একদিন আবু বাকর (রা) উমারকে (রা) বললেন, আমার সাথে উম্মু আইমনের বাড়িতে চল। তাঁকে দেখে আসি যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখতে যেতেন।" তাঁরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) বললেন, "আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে তো রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নেই।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কাছে রাসূলের জন্য কল্যাণ আছে তা জানিনা বলে কাঁদছিনা। কাঁদছি এই জন্য যে আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলো।"

এই কথা শুনে তাঁরাও অশ্রুবিগলিত হলেন। সহীহ মুসলিম

উম্মু আইমন ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) আব্বা আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিবের দাসী। তাঁর আসল নাম ছিলো বারাকাহ। আবদুল্লাহর ইন্তিকালের পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আম্মা আমীনাহর সাথে থাকেন। একবার ছয় বছর বয়সের পুত্র মুহাম্মাদকে নিয়ে আমীনাহ ইয়াসরিব (মাদীনা) যান। ফেরার পথে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন উম্মু আইমনই মুহাম্মাদকে মাক্কায় নিয়ে আসেন।

বালক মুহাম্মাদের প্রতি তাঁর ইহসান ছিলো খুবই বড়ো মাপের। আল্লাহর রাসূল (সা) তা কোনদিন ভুলেননি। মুহাম্মাদ (সা) যখন মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তখন উম্মু আইমন মাদীনাতেই বাস করতেন। রাসূল (সা) মাঝেমধ্যে তাঁর খোঁজ খবর নিতেন। তেষট্টি বছর বয়সে আল্লাহর রাসূল (সা) ইন্তিকাল করেন। উম্মু আইমনের বয়স ছিলো আরো অনেক বেশি।

ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর হওয়ার পর আবু বাকর আস্‌সিদ্দিক (রা) রাসূলের (সা) অনুকরণে তাঁর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) নিয়ে তাঁর বাড়িতে যান।

১৫.৩ উমারের (রা) সাথে এক যুবতী বাজারে গিয়ে সাক্ষাত করেন কেন

যায়িদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে বাজারে গেলাম। একজন যুবতী এগিয়ে এসে উমারের সাথে সাক্ষাত করলো। সে বললো, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামী মারা গেছেন, রেখে গেছেন, কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে। আল্লাহর কসম, তাদের না আছে জীবন ধারণের জন্য কোন খাদ্য, না আছে কৃষি ক্ষেত, না আছে দুধ দেবার মতো কোন পশু। আমার আশংকা তারা অনাহারে মারা যাবে। আমি খুফাফ ইবনু আইমা আল গিফারীর মেয়ে। আমার আব্বা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হুদাইবিয়ায় ছিলেন।"

যুবতীর বক্তব্য শুনে উমার (রা) কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন। তারপর বলেন, "বাহ, তোমার বংশীয় সম্পর্ক তো খুব ঘনিষ্ঠ।" তিনি সেখান থেকে গেলেন আঁস্তাবলের কাছে যেখানে বাঁধা ছিলো একটি মোটাতাজা উট। তিনি উটটির পিঠে দুই বস্তা খাদ্য তুললেন। বস্তা দুইটির মাঝে রাখলেন কাপড় চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। অতপর উমার (রা) যুবতীটির হাতে উটের লাগাম তুলে দিয়ে বলেন, "এটি নিয়ে যাও। এইগুলো শেষ হয়ে যাবার আগেই আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।" সহীহ আল বুখারী

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামী ইন্তিকাল করলে সেই যুবতী অসহায় হয়ে পড়েন। ছোট ছোট কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে তিনি মহা সমস্যার সম্মুখীন। বাধ্য হয়ে তাঁকে সরকারী সাহায্য চাওয়ার জন্য সরকার প্রধান উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট আসতে হয়। তাঁর প্রয়োজন এতো তীব্র ছিলো যে অন্য কোথাও উমারকে (রা) না পেয়ে ফিরে না গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তিনি বাজারে এসে পৌছেন।

১৫.৪ উম্মুদ দারদাহর (রা) সাথে সালমান আল ফারেসী (রা) দেখা করলেন কেন

আবুদ্ দারদাহ (রা) বদর যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। শাজারাতুজ জাহাব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ৩৯

আবুদ্ দারদাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সমবয়সী ছিলেন। দায়িরা-ই-মায়ারিফ ইসলামিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৮০০ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিলো প্রায় পঞ্চান্ন বছর।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে সালমান আল ফারেসীর (রা) ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। অর্থাৎ সালমান (রা) আবুদ দারদাহর (রা) বাড়িতে থাকতে শুরু করেন এবং তাঁর পরিবার সদস্যের মতো মর্যাদা পান। এই বাড়িতে থাকাকালে উম্মুদ্ দারদাহর (রা) সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাত হতো। তখন উম্মুদ্ দারদাহর বয়স কমবেশি পঞ্চাশ বছর হওয়ার কথা। তখনো কিন্তু পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি।

পরবর্তী সময়ে সালমান (রা) অন্যত্র বসবাস শুরু করেন। তবে তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট দীনী ভাই আবুদ্ দারদাহর (রা) বাড়িতে এসে মেহমান হতেন। একবার বেড়াতে এসে তিনি উম্মুদ্ দারদাহকে সাদাসিধে পোষাক পরিহিতা দেখে কিছু প্রশ্ন করেন এবং তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এই ঘটনাটি পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা হতে পারে। পরের হলেও এই ঘটনা প্রমাণ করে না যে উম্মুদ্ দারদাহ (রা) তাঁর সৌন্দর্য খোলা রেখে সালমান আল ফারেসীর (রা) সামনে এসেছিলেন। তদুপরি তখন উম্মুদ্ দারদাহ (রা) এমন এক বয়সে উপনীত হয়েছিলেন বলে মনে হয় যেই বয়সে পর্দার শিথিলতার বিধান প্রযোজ্য হয়।

মহানবীর (সা) সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দেড় লাখ। মোটামুটি অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন মহিলা সাহাবী। তাঁদের মাঝে সংঘটিত কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই যুগে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা প্রচলিত ছিলো বলে প্রমাণ করার প্রয়াস ইসলামের মূল ভাবধারার সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়।

১৬. মহিলাদের শিক্ষা

ইসলাম শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই শিক্ষা প্রয়োজন। দুনিয়ায় যতদিন ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো ততদিন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

শিক্ষার রয়েছে দুইটি ভাগ।

যথা, আদর্শিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আদর্শিক শিক্ষা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই অত্যাবশ্যক। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষার তারতম্য হতে বাধ্য

সকল বয়সের মানুষের জন্য একই সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা হতে পারেনা। শিশুদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রয়োজন। স্বতন্ত্র সিলেবাস প্রয়োজন কিশোরদের শিক্ষার জন্য। তেমনিভাবে যুবকদের শিক্ষার জন্য সিলেবাস হতে হবে ভিন্নতর।

উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা সিলেবাস হয়ে থাকে। যিনি ডাক্তার হবেন তাঁর সিলেবাস যিনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন তাঁর সিলেবাস থেকে ভিন্ন। যিনি আইনবিদ হবেন তাঁর সিলেবাস যিনি সৈনিক হবেন তাঁর সিলেবাস থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ যিনি কর্মজীবনে যেই বৃত্তি গ্রহণ করবেন তিনি সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবেন। অন্যান্য বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই তাঁর।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহিলাদেরকে যেই অংগনে কাজ করার উপযুক্ততা দান করেছেন সেই অংগনের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই তাঁদের জন্য সিলেবাস তৈরী হতে হবে।

আদর্শ মুসলিম মহিলা হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে মহিলাদের অবশ্যি ইসলামের আদর্শিক জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের জীবনদর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সেই আলোকে তাঁরা কিভাবে তাঁদের জীবন গড়ে তুলবেন?

মানব জাতির নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার সুমহান কর্তব্য অর্পিত রয়েছে মহিলাদের ওপর। তাঁরা যাতে এই কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন সেইজন্য তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা জরুরী।

মহিলাদের নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করার কাজ মহিলাদের দ্বারাই ভালো হওয়ার কথা। মহিলারাই পারেন অপরাপর মহিলাদের সাথে মিশতে, ঘনিষ্ঠ হতে এবং অন্তরংগ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। মহিলাগণ অবাধে অপরাপর মহিলাদের নিকট যেতে পারেন, বসতে পারেন এবং পারেন আলাপ করতে। মহিলা শ্রোতাগণ একজন মহিলা আলোচককে নিঃসংকোচে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারেন।

মহিলা অংগনে ইসলামের জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে মহানবীর (সা) স্ত্রীগণ অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। সকল যুগেই এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন বিদূষী মুসলিম মহিলাগণ। এই যুগেও তাঁদেরকে সেই ভূমিকাই পালন করতে হবে। এইজন্য তাঁদেরকে ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করে আপন কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন করার যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য মহিলাদের শিক্ষা সিলেবাসে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিশু পরিচর্যা বিজ্ঞান, প্রসূতি পরিচর্যা বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা দান পদ্ধতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

১৭. অপরিহার্য প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে গিয়ে অর্থোপার্জন করার অনুমতি

কোন মহিলা যদি আশ্রয়হীন এবং অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন তখন জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন।

পর্দা রক্ষা করে কৃষিখামার, কারখানা ও ব্যবসা পরিচালনা কিংবা শিক্ষকতাও করতে পারেন।

আল্লাহর রাসূলের (সা) যুগে একজন মহিলা সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হলে আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুমিতক্রমে তিনি বাগানে গিয়ে খেজুরের ডাল কেটে তা বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করেছেন।

আসমা বিনতু আবীবাকর (রা) বাগানে গিয়ে কাজ করেছেন।

আসমা বিনতু মুহাররমা আতর বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) স্ত্রী হাতে তৈরি করা শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করতেন।

পরিবার-পরিসরের স্বাভাবিক কর্তব্যসমূহ পালন করার পর কোন মহিলা যদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সময় দিতে চান, ইসলাম এতেও বাধ সাধেনা।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মহিলাদেরকে এইসব কাজে অবশ্যই নেমে যেতে হবে। কর্তব্য এক কথা, আর অনুমতি আরেক কথা। বাইরের কাজে সক্রিয় ও সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করা পুরুষদের কর্তব্য। আর বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে মাত্র। মহিলাগণ পুরুষদের মতোই বাইরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়।

বস্তুবাদী সমাজে মহিলাগণ আপন সন্তানদেরকে উপেক্ষা করে অর্থোপার্জনের জন্য বাইরের কর্মকেন্দ্রগুলোর দিকে ছুটছেন। তাঁরা সন্তানদের লালন পালন ও দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন চাকর-বাকরদের ওপর। দিন রাতের প্রায় অর্ধেক সময় তাঁদের সন্তানেরা মাতৃস্নেহ বঞ্চিত থাকছে। চাকর বাকর তো কখনো মায়ের বিকল্প হতে পারে না।

বস্তুবাদী সমাজে স্বামী এক অফিসে, দোকানে বা কারখানায় কাজ করেন, স্ত্রী কাজ করেন আরেক অফিস, দোকান বা কারখানায়। কর্মস্থলে স্বামী ভিন্ মেয়ের সাথে পাশাপাশি বসে কাজ করছেন, অপর দিকে স্ত্রী কাজ করছেন ভিন্ পুরুষের পাশে বসে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী ভিন্ মেয়েটির প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন, আবার স্ত্রীর ভাব জমে ওঠেছে ভিন্ পুরুষটির সাথে। কালক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরে, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং এর সমাপ্তি ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদে।

ইসলাম এইসব অনাকাংখিত পরিণতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে চায় বলে একদিকে পুরুষ ও মহিলাদেরকে নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করে তোলে, অপরদিকে তাদেরকে পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করে একাগ্রচিত্তে স্বীয় কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৮. উপসংহার

১৮.১ ক্ষীণধারা নয়, মূলধারার অনুসরণ প্রয়োজন

আল্লাহর রাসূলের (সা) কোন কোন সাহাবী কোন কোন বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে এমন অভিমত পোষণ করতেন যা সাহাবীকুলের সামগ্রিক অভিমতের সাথে মিলযুক্ত ছিলো না।

বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিভিন্ন বিষয়ে যেই অভিমত পোষণ করতেন আমরা তাঁকে বলবো ইসলামের মূলধারা। পক্ষান্তরে, দুই চারজন সাহাবী যেই মত পোষণ করতেন আমরা তাঁকে বলবো ইসলামের ক্ষীণধারা।

আমরা যদি ইসলামের মূলধারাকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্ষীণধারাকে প্রাধান্য দিই তাহলে আমাদেরকে অনেক রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

যেমন--

(১) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) মনে করতেন যে সূরাহ আল ফালাক এবং সূরাহ আন্ নাস আল কুরআনের অংশ নয়, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার ভাষা হিসেবে আল্লাহ এইগুলো রাসূলকে (সা) শিখিয়েছেন। অথচ বাকি সব সাহাবী এই দুইটিকে আল কুরআনের অংশ গণ্য করতেন। এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) অভিমতকে প্রাধান্য দিলে আল কুরআন থেকে সূরাহ আল ফালাক এবং সূরাহ আন্ নাস বাদ দিতে হয়।

(২) আবু যার আল গিফারী (রা) মনে করতেন যে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই নিজ মালিকানায় রাখা যাবে না। অথচ বিপুল সংখ্যক সাহাবী মনে করতেন যে যাকাত আদায় করা হলে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। এই ক্ষেত্রে আবু যার আল গিফারীর (রা) অভিমতকে প্রাধান্য দিলে পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের পর আর কিছুই আমাদের হাতে রাখা উচিত নয়।

(৩) সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) মনে করতেন যে মুহাজির নয় আনসারগণই আমীরুল মুমিনীন হওয়ার হকদার। কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া মুহাজির এবং আনসার

সাহাবীদের সকলেই আমীরুল মুমিনীন হিসেবে আবু বাকর আস্ সিদ্দিককে (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন মুহাজির। সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) তাঁর অভিমতের ওপর দৃঢ় ছিলেন এবং তিনি আবু বাকর আস্ সিদ্দিকের (রা) নিকট বাইআত হননি। এই ক্ষেত্রে সা'দ ইবনু উবাদাহর (রা) অভিমতকে প্রাধান্য দিলে বলতে হয় যে আবু বাকর আস্ সিদ্দিককে (রা) আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করা এবং তাঁর আমীর পদ গ্রহণ করা ছিলো নাহক কাজ ।

(৪) মুয়াবিয়া (রা) রাজতন্ত্রকে সঠিক ব্যবস্থা মনে করতেন বলেই তিনি তা কায়েম করেছেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) এবং আমর ইবনুল আসের (রা) মতো ব্যক্তিগণ তাঁর পদক্ষেপ সমর্থন করেছেন। অথচ বিপুল সংখ্যক সাহাবী এই পদক্ষেপকে ইসলামের কাংখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার (খিলাফত) সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেছেন।

এই ক্ষেত্রে মুয়াবিয়ার (রা) অভিমতকে যদি প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে রাজতন্ত্রকে ইসলামের কাংখিত ও স্বীকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে হয়।

(৫) আনাস ইবনু মালিক (রা) মহিলাদের চেহারা ঢাকাকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না। অথচ বিপুল সংখ্যক সাহাবীর আমল ছিলো তাঁর অভিমতের বিপরীত। আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তো মহিলাদের চেহারা খোলা রাখাকে "চরম লজ্জাহীনতা" বলে উল্লেখ করেছেন।।

এই ক্ষেত্রে আনাস ইবনু মালিকের (রা) অভিমতকে প্রাধান্য দিলে আমাদেরকে পর্দার ব্যাপারে ইসলামের মূলধারা থেকে সরে যেতে হয়।

কোন ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষীণধারাকে প্রাধান্য দিলে আমরা একটু সুবিধা পাই বিধায় মূলধারাকে উপেক্ষা করে ক্ষীণধারাকে প্রাধান্য দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। বিশেষ করে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকামী যাঁরা তাঁরা যদি মূলধারার পরিবর্তে ক্ষীণধারাকে প্রাধান্য দেন তাহলে কালের এক পর্যায়ে এসে ক্ষীণধারাই হয়ে পড়বে মূলধারা, আর মূলধারা হয়ে পড়বে ক্ষীণধারা। এমনটি হওয়া কি অভিপ্রেত?

এই প্রসংগে আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফানের (রা) একটি নির্দেশ আমাদেরকে পথের দিশা দেবে।

উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মাদীনায় নিজ গৃহে অবরুদ্ধ তখন হাজ্জ মওসুম। একদিন আবু কাতাদাহ এক সংগীকে নিয়ে উসমানের (রা) নিকট গিয়ে হাজ্জে যাবার অনুমতি চান। উসমান (রা) তাঁদেরকে অনুমতি দেন। তাঁরা জানতে চান, যদি বিদ্রোহীরা বিজয়ী হয় তাঁরা কার সাথে থাকবেন। খালীফা বললেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ জামাআতের সাথে।" তাঁরা আবার প্রশ্ন করেন, "যদি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জামাআতই আপনার ওপর বিজয়ী হয় তখন কার সাথে থাকবো?" তিনি বললেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ জামাআত যারাই হোক না কেন তাদের সাথে থাকবে।" হায়াতুস্ সাহাবা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬

১৮.২ "হতে পারে, কোন বিষয় তোমাদের অপছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।" আল বাকারাহ।। ২১৬

স্থুল দৃষ্টিতে কোন বস্তুর দিকে তাকালে সেই বস্তুর যেই তাৎপর্য বুঝা যায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে সেই বস্তুর ভিন্নতর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

স্থুল দৃষ্টিতে আমরা দেখি সূর্য পূর্ব দিক থেকে পথচলা শুরু করে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যায়। অথচ গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে এই উপলব্ধি দান করেছে যে সৌর জগতে সূর্য স্থির হয়ে আছে, আর পৃথিবী নামক গ্রহটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করছে। স্থুল দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় পৃথিবী অতি বড়ো ও বিস্তৃত এক ক্ষেত্র, তার তুলনায় সূর্য অতি ছোট। অথচ গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ আমাদের মাঝে এই উপলব্ধি ঘটায় যে পৃথিবী একটি ছোট গ্রহ মাত্র, আর সূর্যটা তার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়ো।

তেমনিভাবে, মানব সমাজ ও সভ্যতায় অবদান রাখার বিষয়টির দিকে স্থুল দৃষ্টিতে তাকালে মনে হবে যে মহান স্রষ্টা মহিলাদেরকে অতি নগণ্য ধরনের কিছু কর্তব্য পালন করতে বলেছেন, আর পুরুষদেরকে বলেছেন বড়ো বড়ো কাজগুলো করতে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে উপলব্ধি হবে ভিন্নতর। গভীর বিশ্লেষণ আমাদেরকে এই কথাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে যে মহিলাদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেইসব কর্তব্য অর্পণ করেছেন সেইগুলো নিঃসন্দেহে অতি বড়ো। এই কর্তব্য তাঁদের সৃষ্টি-কাঠামো, গুণ-গরিমা, আবেগ-অনুভূতি, মেধা-প্রতিভা এবং শক্তি-সামর্থের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিশীল।

অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহিলাদের ওপর তাঁদের সৃষ্টি কাঠামো, গুণ-গরিমা, আবেগ-অনুভূতি, মেধা-প্রতিভা এবং শক্তি-সামর্থের সাথে সংগতিশীল কর্তব্য অর্পণ করে তাঁদের প্রতি ইনসাফ করেছেন, যুল্ম করেননি।

আমরা মানুষেরা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট। এটা সত্য যে অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষের জ্ঞান বেশি। আবার এটাও সত্য যে এই জ্ঞান মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় খুবই সামান্য। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"

এই সীমিত জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহের যৌক্তিকতা হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ যদি এই সীমিত জ্ঞানের ওপর ভর করে বলতে শুরু করে যে আল্লাহর অমুক বিধানটি তো যুক্তিযুক্ত নয় তাই এটির পরিবর্তন প্রয়োজন, তাহলে বুঝতে হবে যে অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের অপব্যবহার করছে।

আল্লাহ অত্যন্ত মুহব্বত করে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। মানুষের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য তিনিই রচনা করেছেন বিধান। আন্তরিকভাবে তাঁর বিধানের অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহকালের শান্তি এবং পরকালের মুক্তি।

আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর কোন বিধানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে না পারলেও আমাদেরকে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে এই বিধানের অনুসরণের মাঝেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আমাদের কিসে কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তার সঠিক জ্ঞান জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় আল্লাহরই থাকার কথা, আমাদের নয়। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অকল্যাণকর কোন বিষয়কে আমরা কল্যাণকর ভাবতে পারি, আবার কল্যাণকর কোন বিষয়কে ভাবতে পারি অকল্যাণকর। তাই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ওপর ভর না করে আল্লাহর দেয়া বিধানকে অকাতরে মেনে নেয়াই হবে আমাদের উচিত পদক্ষেপ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

২। পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৩। নারী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

৪। পরিবার ও পারিবারিক জীবন, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

৬। ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

৭। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব, অধ্যাপক মুহাম্মাদ রুহুল আমীন

৮। ইসলাম ও নারী, মুহাম্মাদ কুতুব (মিসর)

৯। সিরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নোমানী

১০। বুকের দুধ শিশুদের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, ডাঃ নাজমুল আলম, মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

১১। ক্ষতিকর কনট্রাসেপটিভস, ডাঃ নাজমুল আলম, মাসিক পৃথিবী, এপ্রিল, ১৯৮৭

১২। আপনার সন্তান, ডাঃ মুহাম্মাদ নুরুল হক, মাসিক পৃথিবী, জানুয়ারী, ১৯৯১।